মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর আরোপিত দু'টি শর্ত থেকে সৃষ্ট সংশয় ও তার নিরসন

শায়খ ফজলুর রহমান কাসিমি হাফিযাহুল্লাহ

اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ

মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর আরোপিত দু'টি শর্ত থেকে সৃষ্ট সংশয় ও তার নিরসন

শায়খ ফজলুর রহমান কাসিমি হাফিযাহুল্লাহ

সূচীপত্র

হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর একটি উদ্ধৃতি ৫

দু'টি বক্তব্য ও তার মূল্যায়ন ৭

হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর আলোচিত শর্ত দু'টি ৯

মুফতী তাকী উসমানী সাহেবের বিশ্লেষণ: ১০

রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা বিষয়ে 'ইসলাম আওর সিয়াসী নাযরিয়াত' কিতাবে উল্লেখিত উদ্ধৃতিসমূহ..... ১৪

ফাসেক ও কাফের-মুরতাদ শাসক..... ১৭

আমাদের মূল আলোচনা কি নিয়ে? ২২

শায়খ আবু বকর নাজীর একটি সুন্দর মূল্যায়ন ২৪

হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য ২৮

রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার বাধাগুলো ৩০

কাফের-মুরতাদ শাসক সম্পর্কে থানভী রহিমাহুল্লাহ এর উদ্ধৃতিগুলো: ৩২

জালেম-ফাসেক বিষয়ে থানভী রহিমাহুল্লাহ এর উদ্ধৃতিগুলো: ৩৫

হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর তিনটি কথা: সামর্থ্য, সুস্পষ্ট কুফর ও সুস্পষ্ট প্রকাশ ৪৩

একটি ছোট্ট ভূমিকা ৪৪

এক. সামর্থ্যের জনবল..... ৪৮

দুই. সামর্থ্যের অর্থবল ৫৪

তিন. সামর্থ্যের অস্ত্রবল.....৫৭

চার. সামর্থ্যের কৌশলবল..... ৬৩

সামর্থ্যের চার দিক ও আমাদের বর্তমান অবস্থা..... ৬৫

রাষ্ট্রপক্ষ ও মুসলমান ৭৪

পাঁচ. সামর্থ্য না থাকলে করণীয় কি? ৭৮

শেষ কথা.....৮১

সামর্থ্যের বাস্তবতাঃ কয়েকটি উদাহরণ.....৮২

এক. মুরতাদ তাতার রাষ্ট্র প্রধানের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিদ্রোহ:..৮২

দুই. পরাশক্তি রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান মুসলমানদের জিহাদ:... ৮৭

তিন. আমেরিকা ও বিশ্ব কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে তালেবানের জিহাদ:
.....৮৮

শরীয়তের কিছু মৌলিক নীতিমালা: ৮৮

এক. ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ বলেন, যা মূলত সকল মুজতাহিদ ইমাম মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের কথা-..... ৮৯

আমাদের করণীয়: ৯৪

হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর ২য় কথা: সুস্পষ্ট কুফর ৯৬

হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর ৩য় কথা: সুস্পষ্ট প্রকাশ ৯৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

দ্বীন ও শরীয়তের অনেক স্বীকৃত-স্পষ্ট, সর্বসম্মত ও অকাট্য বিষয়কে অস্পষ্ট ও বিতর্কিত করে তোলার প্রবণতা এখন প্রতিদিনের বাস্তবতা। কুরআনের মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট বিষয়গুলোর পেছনে পড়ে স্পষ্ট বিষয়গুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতার কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন মাজীদে বলে দিয়েছেন। সে প্রবণতার সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে, স্পষ্ট বিষয়গুলোকে অস্পষ্ট করে তোলার মানসিকতা, যা কুরআন মাজীদে বর্ণিত প্রকারের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রকার।

দ্বীন ও শরীয়তের যেসব অকাট্য ও স্পষ্ট বিষয় এ মানসিকতার শিকার তার মধ্যে একটি হচ্ছে, কাফের-মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিদ্রোহের বিষয়টি। অর্থাৎ একটি দারুল ইসলামের রাষ্ট্রপ্রধান মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পর মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার যে ফরয দায়িত্ব রয়েছে এবং যে বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরামের কোন দ্বিমত নেই, সে বিষয়টিকে অস্পষ্ট করে তোলার প্রবণতা এখন ব্যাপক। এ কাজটি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

এক. কুফরে বাওয়াহ বা স্পষ্ট কুফরকে একটি অস্তিত্বহীন কুফর হিসাবে সাব্যস্ত করা। অর্থাৎ যেকোন ব্যক্তি যে কোন কুফরই করুক না কেন, তা বাওয়াহ বা স্পষ্ট হওয়ার সকল রাস্তা বন্ধ করে সে কুফরকে এমন একটি অস্পষ্ট বিষয় হিসাবে প্রমাণিত করা যার দ্বারা ব্যক্তি যত স্পষ্ট কুফরেই লিপ্ত হোক না কেন, সে কখনো কাফের হওয়া সম্ভব হবে না।

দুই. কুফরে বাওয়াহ বা স্পষ্ট কুফর যার থেকে প্রকাশ পেয়েছে তার অন্যান্য কিছু মুসলমানসুলভ আচরণের ভিত্তিতে স্পষ্ট কুফরকে অস্পষ্ট করে তোলা এবং তার মাঝে স্পষ্ট কুফর পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও তাকে মুসলমান এবং মুসলমানদের কর্ণধার হিসাবে মান্য করা।

তিন. কুফরে বাওয়াহ বা স্পষ্ট কুফরকে কুফর হিসাবে মেনে নেয়ার পরও বিভিন্ন অজুহাতে তা স্বীকার না করা, তা প্রকাশ না করা এবং তার উপর নির্ভরশীল অন্যান্য ফরয দায়িত্বগুলোকে এড়িয়ে চলা।

হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর একটি উদ্ধৃতি

প্রসঙ্গক্রমে আলোচনার শুরুতে একটি কথা বলে রাখা ভালো হবে। মুরতাদ ও কাফের রাষ্ট্রপ্রধানকে অপসারণের মাসআলা প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ এর একটি উদ্ধৃতির ইদানিং খুব চর্চা চলছে। উদ্ধৃতিটি হচ্ছে, হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, রাষ্ট্রপ্রধানকে অপসারণের ক্ষেত্রে দু'টি শর্ত প্রযোজ্য। ১. অপসারণের সামর্থ্য থাকা। ২. অপসারণ করতে গিয়ে আরো বড় ধরনের কোন বিশৃংখলা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা না থাকা।

এ উদ্ধৃতির উপর ভিত্তি করে দুই ধরনের আলোচনা পর্যালোচনা পাঠক ও শ্রোতাদের মাঝে খুব চর্চিত হচ্ছে। একটি আলোচনার ফলাফল হচ্ছে, রাষ্ট্রপ্রধান কুফরে বাওয়াহ তথা স্পষ্ট কুফরে লিপ্ত হয়ে মুরতাদ ও কাফের হয়ে যাওয়ার পরও মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা থেকে বিরত থাকা ও সবর করা।

অপর আলোচনার ফলাফল হচ্ছে, রাষ্ট্রপ্রধান কুফরে বাওয়াহ তথা স্পষ্ট কুফরে লিপ্ত হলে তার বিরুদ্ধে মুসলমানরা পর্যায়ক্রমে বিদ্রোহ করা, বিদ্রোহের জন্য অস্ত্রধারণ করা, অস্ত্রধারণের জন্য সামর্থ্য অর্জন করা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং সব শেষে বারাআত ও হিজরত করা ফরয। সবর করা, নির্লিপ্ত থাকা, কাফের রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গ দেয়া, তার কার্যক্রমে সহযোগিতা করা বা এমন অবস্থান গ্রহণ করা যার দ্বারা কাফের রাষ্ট্রপ্রধান উপকৃত হয়, কৌশলের অজুহাতে তার উচ্ছিষ্ট ভোগ করা ইত্যাদি সবই হারাম।

আলোচনার দু'টি দিককেই আমরা একটু বিস্তারিত তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

মুফতী তাকী উসমানী সাহেব দা. বা. হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর আলোচিত বক্তব্যটি তাঁর 'ইসলাম আওর সিয়াসী নাযরিয়াত' কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

মুফতী সাহেব বলেছেন, হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ 'জাযলুল কালাম ফী আযলিল ইমাম' কিতাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং কিতাবটি ইমদাদুল ফাতাওয়ার মাঝে সংযুক্ত হয়ে ছেপেছে। মুফতী সাহেব এ কিতাবটির সারসংক্ষেপ তাঁর 'তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম' কিতাবে সংযুক্ত করেছেন বলেও বলেছেন।

এ মুহূর্তে আমার সামনে মুফতী সাহেবের 'ইসলাম আওর সিয়াসী নাযরিয়াত' এবং 'ইমদাদুল ফাতাওয়া'য় সংযুক্ত 'জাযলুল কালাম ফী আযলিল ইমাম' কিতাবটি আছে। 'তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম' এ উল্লিখিত সারসংক্ষেপটি এখন নেই। আমি হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর কিতাব ও মুফতী তাকী উসমানী সাহেবের যে কিতাবটি আছে সে দু'টির আলোকেই সামনের আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, মুফতী তাকী উসমানী সাহেব হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর উদ্ধৃতি দিয়ে যে কথাগুলো উল্লেখ করেছেন তার কোন কোনটিতে ইমদাদুল ফাতাওয়ার উদ্ধৃতি আছে, আর কোন কোনটিতে নেই। আবার 'ইসলাম আওর সিয়াসী নাযরিয়াত'এ উল্লিখিত কিছু কথা আমি হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর আলোচ্য কিতাবে পাইনি।

এক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে, হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর কিতাবে কথাটি আছে কিন্তু আমার দুর্বলতার কারণে আমি পাইনি। আবার এমনও হতে পারে যে, মুফতী সাহেব হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করার কোন এক পর্যায়ে নিজেও আলোচনা করেছেন। কিন্তু আমি দু'টিকে পার্থক্য করতে পারিনি। এ কারণে যতটুকু কথা হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর কথা হিসাবে আমি নিশ্চিত হতে পারব ততটুকু তাঁর উদ্ধৃতিতে বলব, আর যতটুকুর ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারব না ততটুকু আপাতত মুফতী তাকী উসমানী সাহেবের কথা হিসাবেই উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ। এক্ষেত্রে এক জনের কথা আরেক

জনের কথা হিসাবে চলে আসার সামান্য আশংকা রয়েছে। সে জন্য আমি এখনই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

দু'টি বক্তব্য ও তার মূল্যায়ন

মুফতী তাকী উসমানী সাহেবের 'ইসলাম আওর সিয়াসী নাযরিয়াত' এর দু'টি বক্তব্য শুরুতে দেখে নেয়া যাক। প্রথমটি হচ্ছে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত উবাদা ইবনে সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস প্রসঙ্গে। হাদসিটি হচ্ছে-

على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثرة علينا وان لاننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عند كم من الله فيه برهان. صحيح البخاري، كتاب الفتن

অনুবাদ: "আমরা আমাদের পছন্দ-অপছন্দ, কঠিন-স্বাভাবিক, আমাদের বিপক্ষে স্বজনপ্রীতি ও স্বার্থপরতা সর্বাবস্থায় শ্রবণ ও আনুগত্যের ওপর বাইয়াহ দিয়েছি। এবং এ কথার ওপরও বাইয়াহ দিয়েছি যে, আমরা শাসকদের মাঝে সুস্পষ্ট কুফর দেখার আগ পর্যন্ত - যে কুফরের ব্যাপারে আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে দলিল থাকবে- তাদের সাথে ক্ষমতা নিয়ে টানাটানি করব না।" -সহীহ বুখারী, কিতাবুল ফিতান

হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে-

اس کا حاصل یہ ہے کہ امیر کے خلاف ھتھیار اٹھا کر اس کا تختہ الٹنے کی کوشش صرف اس صورت میں کی جا سکتی ہے جب اس سے کھلا کفر سرزد ھو جائے۔ اسلام اور سیاسی نظریات ص:۳۶۸

অনুবাদ: “এর সারকথা হচ্ছে, আমীরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা শুধুমাত্র তখন করা যাবে যখন তার থেকে সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশ পাবে।” -ইসলাম আওর সিয়াসী নাযরিয়াত পৃ: ৩৬৮

আর কুফরে বাওয়াহ বা স্পষ্ট কুফর এর উদাহরণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে-

لیکن اگر امیر نے اس کو ایک مستقل پالیسی بنا لیا کہ وہ مستقل طور سے لوگوں کو معصیتوں پر مجبور کرنے لگا ہے، اور اس میں غیر اسلامی قوانین کو شریعت کے مقابلہ میں زیادہ بہتر سمجھتا ہے تو یہ کفر صریح ہے۔ اسلام اور سیاسی نظریات ص :۳۶۷

অনুবাদ: “কিন্তু আমীর ও রাষ্ট্রপ্রধান যদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে এমন কোন নীতি গ্রহণ করে যার মাধ্যমে সে মানুষদেরকে নিয়মিত গুনাহ করার উপর বাধ্য করতে থাকে, আর সে ক্ষেত্রে সে অনৈসলামিক আইনকে শরীয়তের বিপরীতে বেশি উপযোগী মনে করে, তাহলে তার এ আচরণ সুস্পষ্ট কুফর।” -ইসলাম আওর সিয়াসি নাযরিয়াত পৃ: ৩৬৭

যার ফলাফল দাঁড়ায় যথাক্রমে-

এক. আমীর ও রাষ্ট্রপ্রধান থেকে সুস্পষ্ট কুফর পাওয়া যাওয়ার পর তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হবে, অস্ত্রধারণের মাধ্যমে তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা হবে।

দুই. আমীর ও রাষ্ট্রপ্রধান যদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে এমন কোন নীতি গ্রহণ করে যার মাধ্যমে মানুষদেরকে গুনাহ করতে বাধ্য করা হয় এবং মানবরচিত অনৈসলামিক আইনকে ইসলামী আইনের চাইতে বেশি উপযোগী মনে করে তাহলে তার এ আচরণ কুফরে বাওয়াহ বা স্পষ্ট কুফর।

অতএব যারা বর্তমান যামানায় মানব জীবনের প্রতিটি পর্ব থেকে ইসলামী আইনকে বিলুপ্ত করে, শরীয়তের আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি জীবন পরিচালনা করাকে অপরাধ হিসাবে সাব্যস্ত করে, মানবরচিত আইনে সবকিছু পরিচালনা করছে এবং সবাইকে সে আইন অনুযায়ী চলতে বাধ্য করছে, তারা মুরতাদ-কাফের। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা মুসলমানদের দায়িত্ব।

হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর উল্লিখিত বক্তব্য থেকেও আমরা বিষয়টি দেখলাম। এ নিবন্ধে দলিলের আলোকে মাসআলাটি আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। শুধুমাত্র হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর উদ্ধৃতি দিয়ে যে কথাগুলোর চর্চা চলছে সে কথাগুলোর পর্যালোচনা উদ্দেশ্য। তাই হাকেম বা শাসক মুরতাদ হওয়া এবং তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের প্রসঙ্গটি এখানে তাঁর উদ্ধৃতি দিয়েই উত্থাপন করা হচ্ছে।

হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর আলোচিত শর্ত দু'টি

হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর উদ্ধৃতিতে প্রচারিত শর্ত দু'টির উল্লেখ আমরা মুফতী তাকী উসমানী সাহেবের কিতাবে এভাবে পেয়েছি-

نیز دو شرطیں اور ظاہر ھیں، اور یہ کہ اس کو طاقت کے ذریعے ھٹادینے کی قدرت ھو، اور دوسرے یہ کہ اس کو ھٹانے میں اور کوئی اس سے بڑا مفسدہ پیش آنے کا اندیشہ نہ ھو۔ اسلام اور سیاسی نظریات ص:۳۶۵

অনুবাদ: "এমনিভাবে আরো দু'টি শর্ত আরো স্পষ্ট। আর তা হচ্ছে, শক্তি প্রয়োগ করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার মত শক্তি সামর্থ্য থাকতে হবে। আর দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, তাকে অপসারণ করতে গিয়ে তার চাইতে বড় কোন বিশৃংখলা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা না থাকতে হবে।" - ইসলাম আওর সিয়াসী নাযরিয়াত পৃ:৩৬৫

دوسري بات يه هے كه، جيسا كه پهلے عرض كيا گيا، اس بات پر تمام حضرات فقها متفق هيں كه خروج جهاں كهيں بهي جائز هوتا هے، اس كے لئے دو شرطيں ضروري هيں. ايك يه كه طاقت كے ذريعه حكومت كو هٹا دينے كي قدرت هو، اور دوسرے يه كه اس كو هٹانے ميں اور كوئي اس سے بڑا مفسده پيش آنے كا انديشه نه هو۔ اسلام اور سياسي نظريات ص:٣٦٨

অনুবাদ: "দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যেমনিভাবে আগেও বলা হয়েছে, এ বিষয়ে সকল ফুকাহায়ে কেরাম একমত যে, বিদ্রোহ যেখানেই বৈধ হয় তার জন্য দু'টি শর্ত জরুরি। একটি শর্ত হচ্ছে, শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতাচ্যুত করার মত সামর্থ্য থাকতে হবে। আর দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, তাকে অপসারণ করলে তার চাইতে বড় কোন বিশৃংখলা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা না থাকতে হবে।" -ইসলাম আওর সিয়াসী নাযরিয়াত পৃ: ৩৬৮

মুফতী তাকী উসমানী সাহেব শর্ত দু'টি উল্লেখ করার ক্ষেত্রে সরাসরি হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর উদ্ধৃতি দেননি। তবে থানভী রহিমাহুল্লাহ এর এ বিষয়ক আলোচনা বিস্তারিত উল্লেখ করতে গিয়ে এ শর্ত দু'টিও উল্লেখ করেছেন। মুফতী সাহেব শর্ত দু'টি উল্লেখ করে যে ফলাফল বিশ্লেষণ করেছেন তা আমরা এখানে তুলে ধরছি।

মুফতী তাকী উসমানী সাহেবের বিশ্লেষণ:

উপরে উল্লিখিত দু'টি শর্তের ভিত্তিতে মুফতী তাকী উসমানী সাহেব বলেন, রাষ্ট্রপ্রধান কাফের মুরতাদ হয়ে গেলেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে বিজয় নিশ্চিত না হলে অস্ত্রধারণ করবে না। তাঁর বক্তব্য দেখুন-

نیز دو شرطیں اور ظاہر ھیں، اور یہ کہ اس کو طاقت کے ذریعے ھٹا دینے کی قدرت ھو، اور دوسرے یہ کہ اس کو ھٹانے میں اور کوئی اس سے بڑا مفسدہ پیش آنے کا اندیشہ نہ ھو. مثلا یہ غالب گمان ھو کہ اس کو ھٹانے کے بعد بھی طالبان اقتدار کے درمیان جنگ جاری رھیگی، اور کسی ایک شخص پر لوگ متفق نھیں ھو سکیں گے، اور تمام تر جد جھد کے بعد بھی عوام کو مسلسل خونریزی کے سوا کچھ ھاتھ نھیں آئے گا، یا اس خانہ جنگی سے فائدہ اٹھاتے ھوے کوئی دشمن ملک پر چڑھائی کر کے ملک پر قبضہ کر لے گا، اور ابھی تک تو صرف امیر ھی کافر تھا، اب پورا ملک (معاذ اللہ) دار الاسلام کی حیثیت کھو بیٹھے گا، اور دشمن ملک کے تسلط سے دار الکفر میں تبدیل ھو جائے گا۔ اسلام اور سیاسی نظریات ص:۳۶۵

অনুবাদ: “এমনিভাবে আরো দু’টি শর্ত আরো স্পষ্ট। আর তা হচ্ছে, শক্তি প্রয়োগ করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার মত শক্তি সামর্থ্য থাকতে হবে। আর দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, তাকে অপসারণ করতে গিয়ে তার চাইতে বড় কোন বিশৃংখলা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা না থাকতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, এমন প্রবল ধারণা হল যে, তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর যারা ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে তাদের পরস্পরে যুদ্ধ চলতে থাকবে এবং কোন একজনের ব্যাপারে সবাই একমত হতে পারবে না। সকল চেষ্টা প্রচেষ্টার পরও সাধারণ মানুষ রাক্তপাত ছাড়া আর কিছু পাবে না, অথবা সেই আত্মকলহের সুযোগ নিয়ে কোন শত্রু দেশের উপর হামলা করে তা দখল করে বসবে। আর এতদিন তো শুধু রাষ্ট্রপ্রধান কাফের ছিল, এখন পুরো দেশ (আল্লাহ না করুন) দারুল ইসলামের মর্যাদা হারিয়ে বসবে এবং দেশের উপর শত্রুর আধিপত্যের কারণে তা দারুল কুফরে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।” -ইসলাম আওর সিয়াসী নাযরিয়াত পৃ:৩৬৫

আলোচিত দু'টি শর্তের উপকারিতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি যে কথাগুলো বলেছেন তা হচ্ছে যথাক্রমে:

ক. কাফের-মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর মুসলমানদের পরস্পরে কোন্দল ও আত্মকলহের আশংকা থাকলে কাফের মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না।

খ. কাফের মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর যদি সাধারণ মুসলমানদের মাঝে রক্তপাতের অশংকা থাকে তাহলে কাফের মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা যাবে না।

গ. কাফের-মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর বাহিরের কোন কুফরী শক্তি দেশ দখল করে ফেলার আশংকা থাকলে দেশের কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা যাবে না।

ঘ. দেশের রাষ্ট্রপ্রধান কাফের-মুরতাদ হলে দেশ দারুল ইসলামই থাকবে, দারুল হারব হবে না। তবে বিদেশী কাফের-মুরতাদরা দেশ দখল করে ফেললে দেশ দারুল হারব হয়ে যাবে। সে দেশ আর দারুল ইসলাম থাকবে না।

উল্লেখ্য, মুফতী সাহেব অন্য জায়গায় বলেছেন, দেশের আইন অনৈসলামিক হলে দেশ দারুল হারব হবে না, যদি রাষ্ট্রপ্রধান মুসলমান হয়। যার অর্থ হচ্ছে, রাষ্ট্রপ্রধান মুসলমান না হলে দেশ দারুল হারব হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি এখানে বলছেন, রাষ্ট্রপ্রধান কাফের-মুরতাদ হয়ে গেলেও দেশ দারুল ইসলামই থাকবে। তবে বিদেশী কাফের-মুরতাদরা দেশ দখল করে ফেললে সেটি দারুল হারব হয়ে যাবে।

দারুল হারব ও দারুল ইসলাম বিষয়ক তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ-

در حقیقت کسی ملک کے دار الاسلام قرار پانے کے لئے اصل بات یہ ہے کہ اس پر مکمل اقتدار مسلمانوں کو حاصل ہو، اور انھیں اپنے احکام جاری کرنے کی مکمل قدرت حاصل ہو۔.....

اوپر آپ نے دیکھا کہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے دار الاسلام کی تعریف میں صرف یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہو، اور اسی بات کو جامع الرموز کی عبارت میں اس طرح تعبیر کیا گیا ہے کہ اس میں مسلمانوں کے امام کا حکم چلتا ہو، یعنی اس کے احکام نافذ ہوتے ہوں، قطع نظر اس کے کہ وہ احکام شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اسلام اور سیاسی نظریات ص :۳۲۵

অনুবাদ: "মূলত কোন একটি দেশ দারুল ইসলাম হিসাবে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য অসল বিষয় হচ্ছে, সে দেশের উপর পরিপূর্ণ ক্ষমতা মুসলমানদের হবে এবং তারা তাদের বিধানাবলী প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে পূর্ণ ক্ষমতাবান হবে। ..... উপরে আপনারা দেখে এসেছেন, আল্লামা সারাখসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দারুল ইসলামের সংজ্ঞায় শুধুমাত্র এ কথাটি উল্লেখ করেছেন যে, তা মুসলমানদের কবজায় থাকবে। আর তাঁর সে কথাটিকেই জামেউর রুমূয কিতাবের বক্তব্যে এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, সে দেশে মুসলমানদের ইমামের হুকুম চলে। অর্থাৎ তার বিধানাবলী প্রয়োগ হয়। চাই তার বিধানাবলী শরীয়তের বিধানাবলীর মোতাবেক হোক বা না হোক।" -ইসলাম আওর সিয়াসী নাযরিয়াত পৃ: ৩২৫

দারুল ইসলাম ও দারুল হারব বিষয়ক তাহকীক এখন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এ বিষয়ে কখনো লেখার সুযোগ হলে আমরা ইনশাআল্লাহ দেখাব যে, দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয় নির্ভরশীল হচ্ছে সে দেশের ইসলামী বা কুফরী আইনের উপর। সুতরাং সারাখসী ও জামেউর রুমুযের বক্তব্য থেকে তিনি যে ফলাফল উদ্ধার করেছেন তা বাস্তবসম্মত নয়। এখানে শুধু আমরা দেখাতে চাই যে, তিনি তাঁর 'ইসলাম আওর সিয়াসী নাযরিয়াত' কিতাবের ৩২৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন, দেশ মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের কবজায় থাকলেই তা দারুল ইসলাম, দেশে চাই কুফুরী আইন চলুক আর চাই ইসলামী আইন চলুক। কিন্তু তিনি একই কিতাবের ৩৬৫-৩৬৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন, রাষ্ট্রপ্রধান কাফের-মুরতাদ হয়ে যাওয়ার

পরও তা দারুল ইসলাম থাকবে। তাই কাফের-মুরতাদ কর্তৃক শাসিত এই দারুল ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য কাফের-মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা উচিৎ হবে। কারণ এতে বিদেশী কাফের-মুরতাদ দেশ দখল করে ফেলবে এবং দেশ দারুল হারব হয়ে যাবে।

এখানে আরেকটি বিষয়ও পরিস্কার করে দেয়া ভালো হবে যে, 'ইসলাম আওর সিয়াসী নাযরিয়াত' কিতাব থেকে যে অংশটুকু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সে অংশে এমন কোন কিছু বাদ দেয়া হয়নি যার কারণে উল্লেখকৃত অংশের উদ্দেশ্য বদলে যেতে পারে।

এ বিশ্লেষণে উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলো ও বিশ্লেষণের ফলাফল:

রাষ্ট্রপ্রধান কাফের-মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পর তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হলে দু'টি শর্ত পাওয়া যেতে হবে -এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার পর এবং বিদ্রোহ করার সমস্যা ও বিদ্রোহ না করার বিভিন্ন সুবিধা আলোচনা করার পর, তাঁর এ মতের সমর্থনে তিনি যে উদ্ধৃতিগুলো উল্লেখ করেছেন সে উদ্ধৃতিগুলো আমরা এখানে উল্লেখ করব এবং দেখব এ উদ্ধৃতিগুলো কাফের-মুরতাদ শাসকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব কি না। বা যাঁদের উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে, তাঁরা কথাগুলো কাফের-মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য বলেছেন কি না?

রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা বিষয়ে 'ইসলাম আওর সিয়াসী নাযরিয়াত' কিতাবে উল্লেখিত উদ্ধৃতিসমূহ

এক. ইমাম আবু হনীফা রহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য:

إن قام به رجل واحد قتل ولم يصلح للناس أمر، ولكن إن وجد عليه أعوانا صالحين ورجالا يرأس عليهم مأمونا في دين الله. وهذه فريضة ليست كالفرائض يقوم بها الرجل وحده، وهذا متى أمر به الرجل وحده أشاط بدمه وعرض نفسه للقتل، فأخاف أن يعين على قتل

نفسه. (من الجواهر المضيئة للقرشي) اسلام اور سياسي نظريات ص : ٣٦٨

অনুবাদ: "দায়িত্বটি যদি একা একজন আদায় করে তাহলে সে মারা যাবে, কিন্তু মানুষদের জন্য কিছুই করতে পারবে না। তবে যদি দায়িত্বটি পালনের জন্য কিছু সৎ সহযোগী ব্যক্তি পাওয়া যায় তাহলে আল্লাহর দ্বীনের বিষয়ে স্বচ্ছ থেকে তাদের উপর নেতৃত্ব দেবে। এটি এমন একটি দায়িত্ব যা অন্যান্য দায়িত্বের মত নয়, যা কোন ব্যক্তি একাই আদায় করে নিতে পারে। যখন মানুষকে একাই এ কাজ নিয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেয়া হবে, তখন সে রক্তে রঞ্জিত হবে এবং নিজেকে খুনের জন্য পেশ করবে। কাজেই আমার ভয় হয় যে, সে নিজেকে হত্যার জন্য সাহায্য করবে।" - ইসলাম আওর সিয়াসী নাযরিয়াত পৃ: ৩৬৮

দুই. হাফেয ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ এর বিবরণ:

الحسن بن صالح كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور. هذا مذهب للسلف القديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه، ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر .... والحسن مع ذلك لم يخرج على أحد.(تهذيب التهذيب، ترجمة الحسن بن صالح) اسلام اور سياسي نظريات ص :٣٦٩

অনুবাদ: "হাসান ইবনে সালেহ অস্ত্রধারণের মত পোষণ করতেন। অর্থাৎ জালেম শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহকে তিনি সমর্থন করতেন। এটি প্রথম যুগের সালাফের অভিমত। কিন্তু পরবর্তীতে এটা না করার উপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কারণ তাঁরা দেখেছেন, বিষয়টি আরো জটিলতার দিকে নিয়ে যায়। যেমন হাররার ঘটনা ও ইবনুল আশআসের ঘটনা ইত্যাদি নিয়ে যারা ভাববে তাদের জন্য সেসব ঘটনা থেকে নসীহত গ্রহণ করার মত অনেক কিছু রয়েছে। এরপরও হাসান কারো বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি।" -ইসলাম আওর সিয়াসী নাযরিয়াত পৃ: ৩৬৯

তিন. ইবনে বাত্তাল রহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য:

قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. اسلام اور سياسي نظريات ص : ٣٦٩

অনুবাদ: "ইবনে বাত্তাল রহিমাহুল্লাহ বলেন, শাসক যদি জুলুমও করে তবু তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করার পক্ষে হাদীসে প্রমাণ রয়েছে। ফুকাহায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, বল প্রয়োগ করে ক্ষমতা দখলকারী শাসকের আনুগত্য করা এবং তার অধীনে জিহাদ করা ওয়াজিব। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চাইতে তার আনুগত্য উত্তম। কারণ বিদ্রোহ করার মাঝে রক্তপাত ও ব্যাপক হত্যাকান্ডের আশংকা রয়েছে। তাদের পক্ষে দলিল হচ্ছে এ হাদীস এবং এর সমর্থক অন্যান্য হাদীস। একটি সুরত ব্যতীত আর কোন সুরতকে তাঁরা এ হুকুম থেকে বাদ দেননি। আর তা হচ্ছে, যখন রাষ্ট্রপ্রধান থেকে স্পষ্ট কুফর পাওয়া যাবে। তখন এ ক্ষেত্রে তার আনুগত্য জায়েয নেই; বরং যাদের দ্বারা সম্ভব তাদের উপর তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব হবে।" -ইসলাম আওর সিয়াসী নাযরিয়াত পৃ: ৩৬৯

চার. সারাখসী রহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য:

وبهذا اللفظ يستدل من يزعم أن الحاكم ينعزل بالجور، وليس هذا بمذهب لنا، وقد بينا ذلك فيما أملينا من شرح الزيادات في باب التحكيم. شرح السير الكبير، باب الاستئجار في أرض الحرب والنفل اسلام اور سياسي نظريات ص : ٣٧٠

অনুবাদ: "যাঁরা মনে করেন জুলুম অত্যাচার করলে শাসক ক্ষমতচ্যুত হয়ে যাবে তাঁরা এ শব্দ দিয়ে দলিল দেন। তবে এটা আমাদের মাযহাব নয়। শরহুয যিয়াদাতের বাবুত তাহকীমে আমি যা লিখিয়েছি সেখানে আমি বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছি।" -ইসলাম আওর সিয়াসী নাযরিয়াত পৃ: ৩৭০

কাফের-মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করার পক্ষে মুফতী তাকী উসমানী সাহেব এ চারটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। যে চারটি উদ্ধৃতির প্রত্যেকটিতে আমরা দেখেছি এগুলোর একটিও কাফের-মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রসঙ্গে নয়। প্রত্যেকটিই জালেম ও ফাসেক রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা প্রসঙ্গে। বরং ইবনে বাত্তাল রহিমাহুল্লাহ সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, রাষ্ট্রপ্রধান থেকে কুফর প্রকাশ পেলে তার বিধান ভিন্ন।

ফাসেক ও কাফের-মুরতাদ শাসক

বিগত অনেক বছর যাবত, বা বলা যায় অনেক যুগ যাবত এ দু'টি বিষয়কে আলাদা করতে দায়িত্বশীলগণের ঘাম ঝরে যাচ্ছে। কাফের-মুরতাদ শাসকের বিধান আলোচনা করতে গেলেই তাকে জালেম ও ফাসেক শাসক বিষয়ক দলিল প্রমাণ দিয়ে ধামাচাপা দিয়ে দেয়া হচ্ছে।

এ পক্ষটি হয়ত বোঝেন না, নয়ত বোঝার চেষ্টা করেন না, অথবা বুঝেও না বোঝার ভান করে জালেম ও ফাসেক শাসক বিষয়ক হাজার হাজার ঘটনা ও সর্বস্বীকৃত সিদ্ধান্তগুলোকে এনে কাফের-মুরতাদ শাসকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দিচ্ছেন। অথচ দু'টির মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

এ বিষয়টি কুরআনে কারীমে, বিভিন্ন হাদীসে এবং ফুকাহায়ে কেরামের সিদ্ধান্তে, সব জায়গায়তেই স্পষ্ট। জালেম-ফাসেক রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধান আলাদা এবং কাফের-মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধান আলাদা। কিন্তু একটি পক্ষ এ স্পষ্ট বিষয়টিকে অস্পষ্ট করে তোলার জন্য দু'টি পর্বে মেহনত করে যাচ্ছে।

একটি পর্ব হচ্ছে এ কথা প্রমাণ করা যে, মুসলমান নামধারী কোন শাসক থেকে কুফরে বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয় পর্ব হচ্ছে, জালেম ও ফাসেক শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধানের সকল দলিল এনে কাফের-মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধানের দলিল হিসাবে স্তুপ করা। যেমনটি আমরা এ লেখার শুরুতেও ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি।

কোন কাফের-মুরতাদ শাসকের শাসন থেকে বেরিয়ে মুসলিম শাসকের অধীনে জীবন কাটানোর জন্য এবং গায়রুল্লাহর আইনের শাসন থেকে বের হয়ে আল্লাহর আইনের শাসনের অধীনে নিজেকে ন্যস্ত করার জন্য মুসলমানদেরকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অবধারিত বিধান দেয়া হয়েছে। আর তা হল, বিদ্রোহ করা ও অস্ত্রধারণের মাধ্যমে জিহাদ করা। কিন্তু সকল তাহকীক ও গবেষণার ফলাফল গড়িয়ে যাচ্ছে এ সিদ্ধান্তের দিকে যে, শাসক কাফের মুরতাদ হয়ে গেলেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অস্ত্রধারণ করা যাবে না, আর গায়রুল্লাহর আইনের অধীনে চলতে বাধ্য হলেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অস্ত্রধারণ করা যাবে না। যদিও শাসকের হাত-পায়ের সংখ্যা ষোলশত এবং মুসলমানের সংখ্যা ষোল কোটি! কাফের-মুরতাদের হাত-পায়ের সংখ্যা বিশশত এবং মুসলমানের সংখ্যা বিশ কোটি হয়!

কাফের-মুরতাদ ও গায়রুল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের এমন স্বীকৃত ও অকাট্য একটি বিধান কিভাবে অপর সাধারণ একটি মাসআলার ভিতরে হারিয়ে যেতে পারে তা কল্পনাই করা যায় না।

একটি দৃষ্টান্তমূলক বাঁক

নিম্নোক্ত বক্তব্যটি পাঠক একটু ধ্যানের সাথে লক্ষ করবেন। নিচে যে বক্তব্যটি চলছে, এখানে দু'টি সুরতের হুকুম বলা হচ্ছে। একটি সুরত হচ্ছে কুফরে বাওয়াহ বা স্পষ্ট কুফরের, আরেকটি হচ্ছে যা স্পষ্ট কুফর নয়। দু'টির হুকুম একই ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করে দেয়া হচ্ছে। দু'টি সুরতের হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে দ্বিতীয় সুরতের দলিল প্রমাণ দিয়ে আলোচনাটিকে শক্তিশালী করা হয়েছে, আর আলোচনার শুরুতে দু'টি

সুরতকেই এ বিধানের আওতাভুক্ত করে ফেলা হয়েছে। প্রথম সুরতের যে আলাদা সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে তা বেমালুম ভুলে যাওয়া অথবা ভুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠক আমাদের উপর দোষারোপ না করে একটু দেখুন-

ایک یہ کہ خاص طور پر آخري صورت میں آراء کا اختلاف ہو سکتا ھے کہ آیا امیر کے مسلسل خلاف شریعت عمل کو کفر بواح کے ساتھ ملحق کیا جا سکتا ھے یا نھیں؟ چنانچہ یہ ممکن ھے کہ بعض لوگ یہ کھے کہ اس کے خلاف خروج کرنا چاھئے، اور بعض کھیں کہ خروج نھیں کرنا چاھئے. ایسا اختلاف آراء اجتھادي اختلاف ھوگا، اور اس میں کوئي جانب قابل ملامت نھیں ھوگي. چنانچہ صدر اول میں یزید اور بنو امیۃ کے حکمرانوں کے خلاف حضرت حسین رضي اللہ تعالی عنہ نے یا اھل حرہ نے جو خروج فرمایا، اس میں اسي قسم کا اجتھادي اختلاف تھا. نیز حضرت امام ابو حنیفۃ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زید بن علی اور ابراھیم نفس زکیۃ رحمھما اللہ تعالی کے خروج کي جو حمایت کي، اور اس کے بارے میں بھي دوسرے حضرات نے جو اختلاف فرمایا، اس کي وجہ بھي یھي تھي.

دوسري بات یہ ھے کہ، جیسا کہ پھلے عرض کیا گیا، اس بات پر تمام حضرات فقھا متفق ھیں کہ خروج جھاں کھیں بھي جائز ھوتا ھے، اس کے لئے دو شرطیں ضروري ھیں. ایک یہ کہ طاقت کے ذریعہ حکومت کو ھٹا دینے کي قدرت ھو، اور دوسرے یہ کہ اس

کو ھٹانے میں اور کوئی اس سے بڑا مفسدہ پیش آنے کا اندیشہ نہ ھو. اس بارے میں بھی اختلاف رائے کا امکان ھے. اسلام اور سیاسی نظریات ص :۳۶۷-۲۶۸

অনুবাদ: "একটি হচ্ছে এই যে, বিশেষত শেষ সুরতে এভাবে মতামতের পার্থক্য হতে পারে যে, আমীরের ধারাবাহিক শরীয়তবিরোধী আচরণকে কুফরে বাওয়াহ-স্পষ্ট কুফরের সাথে যুক্ত করা যায় কি যায় না? এ ক্ষেত্রে এমনটি হতে পারে যে, কেউ কেউ বলবেন, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা চাই। আর কেউ কেউ বলবেন, বিদ্রোহ না করা চাই। মতামতের এ পার্থক্যগুলো ইজতিহাদভিত্তিক ইখতেলাফ হিসাবে ধর্তব্য হবে। এ ক্ষেত্রে কোন পক্ষকেই দোষ দেয়া যাবে না। যেমন প্রথম যুগে দেখা যায়, ইয়াযীদ ও বনু উমাইয়ার শাসকদের বিরুদ্ধে হযরত হোসাইন রাযিয়াল্লাহ তাআলা আনহু অথবা হাররাবাসী যে বিদ্রোহ করেছে, সে বিদ্রোহ নিয়ে এ ধরনের ইজতিহাদী মতপার্থক্য ছিল। এমনকি ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত যায়দ ইবনে আলি ও ইবরাহীম নাফসে যাকিয়্যা রাহিমাহুমাল্লাহু তাআলার বিদ্রোহের পক্ষে যে সহযোগিতা করেছিলেন এবং এ বিষয়ে অন্যান্য যারা দ্বিমত করেছেন, তার কারণও এটাই ছিল।"

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যেভাবে আগেও বলা হয়েছে যে, এ বিষয়ে সকল ফুকাহায়ে কেরাম একমত যে, বিদ্রোহ যেখানেই বৈধ হবে তার জন্য দু'টি শর্ত পাওয়া যাওয়া জরুরি। একটি হচ্ছে, শক্তি ব্যবহার করে শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করার সামর্থ্য থাকা। আর দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার দ্বারা আরো বড় কোন বিশৃংখলা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা না থাকা। এ বিষয়েও দ্বিমত থাকার সম্ভাবনা আছে।" -ইসলাম আওর সিয়াসী নাযরিয়াত পৃ: ৩৬৭-৩৬৮

উল্লেখ্য, মুফতী তাকী উসমানী সাহেব হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর উদ্ধৃতি দিয়ে দুই প্যারা আগে নিচের কথাগুলো উল্লেখ করেছেন। যেখানে আলাদা দুটি সুরত খুব পরিস্কারভাবে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু দু'টি

সুরতেরই একটি সমাধান দেয়া হয়েছে যা কোনভাবেই সম্ভব নয়। হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর বাতলানো সুরতদু'টি দেখুন-

اس کے علاوہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ھیں کہ ایک اور صورت ایسي ھے جس میں امیر کا فسق دوسروں تک متعدي ھو رھا ھو، یعني امیر لوگوں کا دین خراب کر رھا ھو، مثلا لوگوں کو معصیت پر مجبور کر رھا ھو، تو اگر یہ عمل کسي ایک یا دو فرد کے ساتھ ھو تو اس کا حکم اکراہ ھوگا، اور اکراہ کے احکام جاري ھوں گے، لیکن اگر امیر نے اس کو ایک مستقل پالیسي بنا لیا کہ وہ مستقل طور سے لوگوں کو معصیتوں پر مجبور کرنے لگا ھے، اور اس میں غیر اسلامي قوانین کو شریعت کے مقابلہ میں زیادہ بھتر سمجھتا ھے تو یہ کفر صریح ھے، اور اگر فوقیت نھیں دیتا لیکن تاویلا (شریعت کي غلط تشریح کر کے) یا تکاسلا (سستي کي بنا پر) اس کو چھوڑا ھوا ھے تو بھي اگرچہ یہ کفر صریح نہ ھو، لیکن کفر کے حکم سے ملحق ھو سکتا ھے، کیوں کہ اس سے شریعت کا استخفاف لازم آتا ھے، لھذا اس صورت میں بھي خروج جائز ھے، لیکن یھاں دو اھم باتیں یاد رکھني ضروري ھیں.

اسلام اور سیاسي نظریات ص: ۳٦۷

অনুবাদ: "এছাড়া হযরত থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আরেকটি সুরত এমন আছে যে সুরতে আমীরের ফিসক অপরাধ অন্যদের পর্যন্ত গড়ায়। অর্থাৎ আমীর মানুষের দ্বীন নষ্ট করছে। যেমন মানুষদেরকে গুনাহ করতে বাধ্য করছে। এক্ষেত্রে এ কাজটি যদি এক দুই ব্যক্তির সাথে হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে ইকরাহ-বাধ্য করার বিধান হবে। তার জন্য বাধ্য করার বিধান প্রযোজ্য হবে। কিন্তু আমীর ও রাষ্ট্রপ্রধান যদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে এমন কোন নীতি গ্রহণ করে যার মাধ্যমে সে

মানুষদেরকে নিয়মিত গুনাহ করার উপর বাধ্য করতে থাকে, আর সে ক্ষেত্রে সে অনৈসলামিক আইনকে শরীয়তের বিপরীতে বেশি উপযোগী মনে করে, তাহলে তার এ আচরণ সুস্পষ্ট কুফর। আর যদি প্রাধান্য না দেয়, কিন্তু অপব্যাখ্যা করে বা অলসতা করে তাকে ছেড়ে দিয়ে আছে, সে ক্ষেত্রেও যদিও এটা সুস্পষ্ট কুফর নয়, কিন্তু কুফরের বিধানের সাথে যুক্ত হতে পারে। কেননা এর দ্বারা শরীয়তের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায়। অতএব এ সুরতেও বিদ্রোহ জায়েয আছে। তবে এ ক্ষেত্রে দু'টি জরুরী কথা মনে রাখা চাই।" -ইসলাম আওর সিয়াসী নাযরিয়াত পৃ: ৩৬৭

হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ তাঁর আলোচনায় দু'টি সুরত খুবই সুস্পষ্ট করে আলাদা করে দিয়েছেন। একটি সুরত কুফরে বাওয়াহ-সুস্পষ্ট কুফরের, আরেকটি সুরত অস্পষ্ট কুফরের। মুফতী তাকী উসমানী সাহেব কুফরে বাওয়াহ-সুস্পষ্ট কুফরের সুরতটিকে অস্পষ্ট কুফরের যে সুরত বলা হয়েছে সে সুরতের মাঝে বিলীন করে দিয়ে, সুস্পষ্ট কুফরকে অস্পষ্ট কুফরের অনুগত বানিয়ে অস্পষ্ট কুফরের বিস্তারিত আলোচনাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এখন আমরা হয়ত বলব, তিনি সুস্পষ্ট কুফর ও অস্পষ্ট কুফর উভয়ের বিধানকে বরাবর মনে করেন। অথবা বলব, তিনি সুস্পষ্ট কুফরের বিষয়টি বিশেষ কোন কারণে এড়িয়ে গেছেন। তবে আমরা যাই বলব, তার কোনটিই আপত্তি থেকে মুক্ত নয়।

আমাদের মূল আলোচনা কি নিয়ে?

বিগত কয়েক যুগ ধরে আমাদের এ বিষয়ক আলোচনাগুলো কি নিয়ে? শাসকের সগীরা-কবীরা গুনাহ নিয়ে? না কি শাসকের কুফর নিয়ে? হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ শাসকদের যে আচরণটিকে সুস্পষ্ট কুফর বলে সাব্যস্ত করলেন, আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানবরচিত গণতান্ত্রিক আইনকে যারা প্রাধান্য দিয়ে প্রতিনিয়ত কুফরী করে চলেছে, যে গণতন্ত্র বিগত প্রায় শতাব্দীকালব্যাপী বিশ্বের মুসলমানদের উপর মানবরচিত গায়রুল্লাহর আইন চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে প্রতিনিয়ত গুনাহ

করতে বাধ্য করছে তাদের কুফর, তাদের ইরতিদাদ, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ এবং সে সকল মুরতাদ-কাফের-তাগুতদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করার বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে, তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের করণীয় কি তা নিয়ে আলোচনা চলছে। মুসলমানদের ফরয দায়িত্ব কি তা নিয়ে আলোচনা চলছে।

কিন্তু আমাদের মাশায়েখ ও যিম্মাদারগণ সুস্পষ্ট কুফর ও সুস্পষ্ট কাফের মুরতাদ শাসকের আলোচনাটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফাসেক ও গুনাহগার জালিম শাসকের দরবারে নিয়ে হাজির করেন। আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কাফের-মুরতাদ শাসকের বিধান। কিন্তু তাঁরা ফাসেক ও জালেম শাসকের বিধান বর্ণনা করতে করতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যয় করে চলেছেন। আলোচনা চলছে কাফের-মুরতাদ শাসকদেরকে নিয়ে। কিন্তু তাঁরা ইয়াযীদের বিরুদ্ধে হোসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিদ্রোহের কাহিনী লিখতে লিখতে নিজেরাও ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন, পাঠককেও ক্লান্ত করে চলেছেন। আলোচনা চলছে শরীয়তের বিধান বিলুপ্তকারী গণতান্ত্রিক মানবরচিত গয়রুল্লাহর আইনের প্রতিষ্ঠাতাদেরকে নিয়ে। কিন্তু তারা খেলাফতে বনু উমাইয়ার খলিফাদের বিরুদ্ধে ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ, হাসান ইবনে সালেহ রহিমাহুল্লাহ এর ফাতওয়া, তাঁদের অবস্থানের বিশদ বিশ্লেষণ করে চলেছেন।

কুরআন হাদীসের বিধানের উপর ঘোষণার দিয়ে তালা লাগিয়ে রেখে যারা মানবরচিত গণতান্ত্রিক গায়রুল্লাহর আইনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শপথ করে তা বাস্তবায়ন করে চলেছে, তাদেরকে যারা বনু উমাইয়া ও আব্বাসী খলিফাদের শরীয়তবিরোধী কর্মকান্ডের সঙ্গে তুলনা করে, তাঁদের কাছে কি সুস্পষ্ট কুফর ও কবীরা গুনাহের মাঝে কোন সীমারেখা নেই? থানভী রহিমাহুল্লাহ যে সুস্পষ্ট কুফরের উদাহরণ তুলে ধরে তাকে অস্পষ্ট কুফর থেকে আলাদা করে দেখিয়ে দিলেন, এখান থেকেও কি আমরা ফাসেক-জালিম শাসক ও কাফের-মুরতাদ শাসকের পার্থক্য বুঝতে পারি না?

যদি আমরা পার্থক্য বুঝে থাকি তাহলে দু'টিকে বার বার একই পাত্রে কেন গুলিয়ে ফেলছি? একটির কথা বলতে গিয়ে আরেকটি দলিল

কেন টেনে আনছি? একটির দলিল দিতে গিয়ে আরেকটির উদাহরণ কেন টেনে আনছি?

শায়খ আবু বকর নাজীর একটি সুন্দর মূল্যায়ন

শায়খ আবু বকর নাজী বলেন-

"…. বাস্তবতার সাথে এ পরিভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কী ধরনের বিকৃতি আজ ঘটছে তা দেখানোর জন্য আমরা একটি নির্দিষ্ট আলোচনার দিকে তাকাব।

বিষয়টি হল, মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ক্ষেত্রে মাসলাহা-মাফসাদা (কল্যাণ-অকল্যাণ)।

পরিভাষার বিকৃতি কত ক্ষতিকারক হতে পারে তা বোঝার জন্য এটি একটি ভালো প্র্যাকটিকাল উদাহরণ। তাছাড়া দুই শতাব্দী যাবত যেসব কাফির আসলি মুসলিম ভূখন্ডগুলোর উপর হামলা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের আলোচনার সাথে এটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

মাসলাহা-মাফসাদাহ পরিভাষাটি ভুলভাবে সংজ্ঞায়িত করার কারণে এবং এ ব্যাপারে বিকৃত বুঝের ফলে মুরতাদ শাসকের সাথে সঠিকভাবে বোঝাপড়া করা সম্ভব হয়নি।

বিকৃতকারীরা প্রথমে শুরু করেছে একটি সঠিক অবস্থান থেকে। আর তা হল, 'শরীয়তের বিধানাবলী এসেছে যাবতীয় কল্যাণ অর্জন করতে ও তা যথাসম্ভব পরিপূর্ণতায় পৌঁছাতে। এমনিভাবে যাবতীয় অকল্যাণ দূর করতে এবং সেগুলো যথাসম্ভব হ্রাস করতে। আর মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নির্দেশটিও এর অন্তর্ভুক্ত'। এ পর্যন্ত তাদের কথা ঠিকই আছে।

তবে এরপর তারা মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে জালিম শাসকের যুলুমের প্রতিরোধ করার সাথে কেয়াস করে এগিয়েছে। এরপর তারা এমন সব বক্তব্য প্রদান করে, যেগুলোর স্বপক্ষে কেয়ামত পর্যন্ত সালাফের কারো বক্তব্য তারা দেখাতে পারবে না। আর তাদের এ ভুলের

ফলে ইসলামী অঙ্গনে ব্যাপক মতবিরোধ দেখা যায়। তারা যদি এ বিষয়ে সালাফের আদর্শের উপর থাকতো তবে এ মতবিরোধ করার কোনই প্রয়োজন ছিল না।

তাওহীদ ও জিহাদপন্থীদের সামনে বিকৃতভাবে মাসলাহা-মাফসাদাহর স্লোগান তোলা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে জনসাধারণকে তাওহীদ ও জিহাদের পথ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্তভাবে তাদের ভুলগুলোর বর্ণনা নিম্নরূপ:

'মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ' একটি আত্মরক্ষামূলক জিহাদ যা (শরীয়ত কর্তৃক) নির্দেশিত। এটি উম্মাহর সকলের জন্য ফরযে আইন, কাজেই কিছু সংখ্যকের আমল দ্বারা সকলের ফরয আদায় হবে না। আল্লামা ইবনে হাজার আলআসকালানী রহিমাহুল্লাহ এ ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করে বলেছেন-

'কুফরের কারণে ইমাম অপসারিত হবে- এটা সর্বসম্মত মত। সুতরাং এ ব্যাপারে প্রত্যেক মুসলমানের পদক্ষেপ নেওয়া (জিহাদ করা) ওয়াজিব। সুতরাং অপসারণ করতে যে সক্ষম হবে সে সাওয়াব লাভ করবে, আর যে অপারগ হবে সে হিজরত করতে হবে, আর যে এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে সে গুনাহগার হবে'।

কুরআনের যেসব আয়াত এবং যেসব হাদীসে কুফফার ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বলা হয়েছে, মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদের বিষয়টি সেগুলোর প্রত্যেকটির ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে জালিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নির্দেশ কোথাও আসেনি। (হ্যাঁ, কুরআন-সুন্নাহ'র কিছু বক্তব্যের ব্যাপকতায় তার জুলুম প্রতিহত করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়।) বরং কিছু আম নুসূসে জালিম মুসলিম শাসকের জুলুম প্রতিরোধ করার কথা এসেছে। এক্ষেত্রে মৌলিকভাবে নির্দেশনা হল ধৈর্যধারণ করা। আর মুসলিম জালিম শাসকের জুলুমকে প্রতিহত করতে গেলে যদি আরও বড় জুলুমের শিকার হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে তা থেকে বিরত থাকা। তাছাড়া জুলুম প্রতিরোধ করা মানে

বাইয়াত ভঙ্গ করা নয়। অর্থাৎ কেউ জালিম শাসকের জুলুম প্রতিহত করার দ্বারা তার আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়াও সাব্যস্ত হয় না।

তাহলে কোন মূলনীতির আলোকে জালিম মুসলিম শাসকের জুলুম প্রতিরোধের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম আমভাবে যেসব নিয়ম উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর সাথে মুরতাদ শাসক কিংবা কাফির আসলির বিরুদ্ধে জিহাদের কিয়াস করা যায়?

সুতরাং মুসলিম জালেম শাসকের জুলুম প্রতিহত করা সংক্রান্ত যেসব নীতিমালা ওলামায়ে কেরাম নির্ণয় করেছেন সেগুলোকে কাফের বা মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদের সাথে কিভাবে মিলানো যেতে পারে?

জিহাদের ময়দানে প্রাণহানী এবং পরাজয়ের আশংকা আছে, কিন্তু এই আশংকা কখনোই এমন মাফসাদাহ (অকল্যাণ) হিসাবে বিবেচিত হয়নি, যার কারণে জিহাদকে বিলম্বিত করা যায়। স্কুলের ছাত্রও এ কথা বোঝে।

মুরতাদ শাসকের অধীনে বসবাসের ফলে যে ক্ষতি বা অকল্যাণ হয়, তা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ক্ষতির চেয়ে অনেক অনেক বেশি। অন্য দিকে জালিম মুসলিম শাসকের অধীনে বসবাস করার ক্ষতি, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ফলে হওয়া ক্ষতির তুলনায় কম।"

শায়খ আবু বকর নাজীর বক্তব্য এখানে শেষ।

এর চাইতে বড় মাফসাদা কি?

একটি দেশ পরিচালিত হচ্ছে গায়রুল্লাহর আইন দিয়ে। সে দেশের শাসক সুস্পষ্ট কুফরে লিপ্ত হয়ে মুরতাদ হয়ে গেছে। এ কুফরী আইন বিলুপ্ত করে শরয়ী আইন প্রতিষ্ঠা করা এবং এ মুরতাদ শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করে মুসলিম শাসকের হাতে দেশকে ন্যস্ত করা এটা মুসলমানদের ফরয দায়িত্ব।

মুফতী তাকী উসমানী সাহেব বলছেন, এটা করতে গিয়ে যদি এর চাইতে বড় মাফসাদার আশংকা থাকে তাহলে এ কাজগুলো করবে না। আবার তিনি এ ক্ষেত্রে হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর উদ্ধৃতিও টেনে এনেছেন। হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর নিজের লেখায় এ কথা আছে কি না? তা আমরা পরবর্তী শিরোনামে ইনশাআল্লাহ দেখব।

এখন এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, একজন মুসলমানের জীবনে এর চাইতে বড় মাফসাদা কি? মুফতী তাকী উসমানী সাহেবের 'ইসলাম আওর সিয়াসী নাযরিয়াত' কিতাবের দু'টি সুস্পষ্ট বক্তব্য আমরা ইতিমধ্যে এ নিবন্ধেই উল্লেখ করে এসেছি। একটি বক্তব্যে তিনি বলেছেন, একটি দেশ দারুল ইসলাম হওয়ার জন্য তার শাসক মুসলমান হওয়া জরুরী, সে দেশের আইন শরয়ী? না কি গায়রে শরয়ী? তা বিবেচ্য বিষয় নয়। আরেকটি বক্তব্যে বলেছেন, শাসক কাফের-মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পরও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না। কারণ এতে বাহিরের কুফরী শক্তি এসে দেশ দখল করে ফেলতে পারে।

এতে ফলাফল কি দাঁড়াল? কোটি কোটি মুসলমান কুফরী আইনের অধীনে কাফের-মুরতাদ শাসকের আনুগত্য করে যাবে। আর একে বলা হবে 'সবর', একে বলা হবে 'দুনিয়াবিমুখতা', একে বলা হবে, 'মাসলাহাত'।

মুফতী তকী উসমানী সাহেব যে বড় 'মাফসাদা'র ভয়ে গায়রে শরয়ী আইন ও কাফের-মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে দিচ্ছেন না, সে বড় মাফসাদা কি? তিনি বলেছেন, বাহিরের কুফরী শক্তি এসে দেশ দখল করে ফেলতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বাহিরের কুফরী শক্তি দেশ দখল করার পর তো এই হবে যে, দেশ গায়রে শরয়ী আইনে চলবে এবং দেশের প্রধান কাফের হবে। বিদ্রোহ না করলেও তা-ই হচ্ছে। পার্থক্য হল, বিদ্রোহ না করলে গায়রে শরয়ী আইন ও কাফের-মুরতাদের অধীনে দেশ চলাটা নিশ্চিত এবং চলমান বাস্তবতা। আর বিদ্রোহ করলে তা হবে সম্ভাব্য। নিশ্চিতও নয়, চলমান বাস্তবতাও নয়। তাহলে আমরা কোনটাকে বড় মাফসাদা বলব?

দ্বিতীয় কথা এবং মূল কথা হচ্ছে, মুফতী সাহেব তাঁর এ বক্তব্যের পক্ষে কোন দলিল দেননি। তিনি যত দলিল দিয়েছেন, যত ঘটনা বর্ণনা করেছেন সবই হচ্ছে ফাসেক ও জালিম শাসক সম্পর্কে। এমনকি হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাও ফাসেক ও জালিম শাসক সম্পর্কে। তাই এ দু'টির পার্থক্য না করে হুকুম বলে দেয়াটা কেমন হল?!

এবার আমরা হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর নিজের বক্তব্যগুলোও একটু দেখি।

হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য

হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর যে বক্তব্যগুলো 'ইসলাম আওর সিয়াসী নাযরিয়াত' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে তার কিছু আমরা উল্লেখ করেছি। আর কিছু বক্তব্যের ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি যে, সেগুলো তাঁর বক্তব্য কি না, সে কারণে তাঁর নিজের লেখা থেকে এ বিষয়ক বক্তব্যগুলো উল্লেখ করছি। ইমদাদুল ফাতাওয়ার সঙ্গে ছাপা তাঁর 'জাযলুল কালাম ফী আযলিল ইমাম' কিতাব থেকে তাঁর বক্তব্যগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে। ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫ম খণ্ডের ১২৯ পৃষ্ঠায় আলোচ্য পুস্তিকায় হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ রাষ্ট্রপ্রধানের শরীয়ত বিরোধী অবস্থান এবং তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার সাতটি অবস্থাকে একটি নকশা করে দেখিয়েছেন। তিনি সেখানে সাতটি ভাগ এভাবে করেছেন-

اولا وہ اقسام بشکل جدول بھي اور عبارت میں بھي لکھے جاتے ھیں، اس کے بعد احکام ذکر کئے جاویں گے، وہ اقسام یہ ھیں:

امر مخل بالامامت

۱-اختیاري یعني خلع بلاسبب

۲ -غير اختياري مثل مرض مانع عن العمل واسر ممتد وعجز عن العمل

۳ -كفر

۴ -غير متعدي الى الغير مثل شرب خمر وغيره

۵ -متعدي يعني ظلم باخذ الاموال اجتهادي

۶ -متعدي يعني ظلم باخذ الاموال غير اجتهادي

۷ -بالاكراه على المعصية

.....

قسم ثالث:-نعوذ باللہ کافر ھو جاوے، خواہ بکفر تکذیب و جحود وخواہ بکفر عناد ومخالفت خواہ بکفر استخفاف واستقباح امور دین....

.....امداد الفتاوي ۵/۱۲۹

قسم ثالث کا حکم: معزول ھو جاوے گا اور اگر جدا نہ ھو بشرط قدرت جدا کر دینا علی الاطلاق واجب ھے- لقوله في العبارة الثالثة كالردة- مگر اس میں شرط یہ ھے کہ وہ کفر متفق علیہ ھو، بدلیل الحدیث الأول کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برھان مع انضمام الإجماع المذکور سابقا. اور جس طرح اس کا کفر ھونا

قطعي هو اسي طرح اس كا صدور بهي يقيني هو، مثل رويت عين كے نه كه محض روايات ظنيه كے درجه ميں، كما دل عليه قوله عليه السلام: إلا أن تروا لمراد رؤية العين، بدليل تعديته إلى مفعول واحد. ص:١٣٣، امداد الفتاوي ٥/١٣٣

অনুবাদ: "প্রথমে সে প্রকারগুলো একটি নকশায়ও দেখানো হচ্ছে এবং লিখেও দেয়া হচ্ছে। এরপর সেগুলোর হুকুম উল্লেখ করে দেয়া হবে। প্রকারগুলো এই-

রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার বাধাগুলো

১. নিজ ইচ্ছায়। অর্থাৎ কোন কারণ ছাড়াই ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানো।

২. ইচ্ছাবহির্ভূত ওযর। যেমন এমন অসুস্থতা যা কাজ করতে বাধা দেয়, দীর্ঘমেয়াদী বন্দী অবস্থা ও কাজ করতে অক্ষমতা।

৩. কুফর।

৪. অপরকে স্পর্শ করে না এমন গুনাহ ও অপরাধ। যেমন মদপান ইত্যাদি

৫. অপরকে স্পর্শ করে এমন গুনাহ ও অপরাধ। অর্থাৎ জুলুম। মানুষের সম্পদ দখল করা। (ইজতিহাদী)।

৬. অপরকে স্পর্শ করে এমন গুনাহ ও অপরাধ। অর্থাৎ জুলুম। মানুষের সম্পদ দখল করা। (গায়রে ইজতিহাদী)।

৭. অপরকে গুনাহ করতে বাধ্য করার অপরাধ।

.....

তৃতীয় প্রকার: নাউযুবিল্লাহ! যদি কাফের হয়ে যায়। চাই তা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার দ্বারা হোক বা অস্বীকার করে হোক। চাই হঠধর্মিতা ও বিরোধিতা করে হোক বা দ্বীনী বিষয় নিয়ে ঠাট্টা ও নিন্দা করে হোক। .....।" -ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/১২৯

.....

তৃতীয় প্রকারের হুকুম: ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাবে। সামর্থ্য থাকার শর্তে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা সর্বাবস্থায় ওয়াজিব। তৃতীয় ইবারত: 'যেমন মুরতাদ হওয়া' বক্তব্যের ভিত্তিতে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, কুফর যেন সর্বসম্মত কুফর হয়। কারণ প্রথম হাদীসে এসেছে, 'সুস্পষ্ট কুফর যে বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে প্রমাণ আছে'। পাশাপাশি এর পক্ষে ইজমাও রয়েছে যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যেমনিভাবে কুফরটি অকাট্য কুফর হওয়া জরুরী, তেমনিভাবে ব্যক্তি থেকে তা প্রকাশ পাওয়াও নিশ্চিত হতে হবে। যেমন চোখে দেখা। ধারণা নির্ভর বর্ণনা পর্যায়ের নয়। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ﷺ أن تروا কথাটি দ্বারা চোখে দেখাই উদ্দেশ্য। এর দলিল হচ্ছে, এখানে শব্দটিকে এক মাফঊলের দিকে মুতাআদ্দী করা হয়েছে।" -ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/১৩৩

মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার বিষয়ে হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর উদ্ধৃতি দিয়ে যে দু'টি শর্তের ব্যাপক প্রচার করা হয়: ১. অপসারণের সামর্থ্য থাকা। ২. অপসারণ করতে গিয়ে আরো বড় ধরনের কোন বিশৃংখলা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা না থাকা। -এ দু'টির প্রথমটির উল্লেখ তাঁর বক্তব্যে রয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়টির উল্লেখ তাঁর বক্তব্যে নেই। আর দ্বিতীয় শর্তটির উপর মুফতী তকী উসমানী সাহেব অত্যন্ত জোরদার আলোচনা করতে গিয়ে এ কথা সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন যে, রাষ্ট্রপ্রধান থেকে কুফরে বাহওয়াহ তথা সুস্পষ্ট কুফর পাওয়া গেলেও বিদ্রোহ করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম। পক্ষান্তরে হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এ অবস্থায় বিদ্রোহ করাকে ওয়াজিব বলেছেন।

হ্যাঁ, হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ সামর্থের শর্ত উল্লেখ করেছে এবং সঙ্গে আরো দু'টি কথা বলেছেন। একটি হচ্ছে কুফর নিশ্চিত কুফর হতে হবে এবং তা রাষ্ট্রপ্রধান থেকে প্রকাশ পাওয়াও নিশ্চিত হতে হবে। থানভী রহিমাহুল্লাহ এর এ তিনটি কথা নিয়ে আমরা কিছু কথা বলব ইনশাআল্লাহ। তবে এর আগে সংক্ষেপে বলে যেতে চাই যে, মুফতী তাকী উসমানী সাহেব থানভী রহিমাহুল্লাহ এর উদ্ধৃতি দিয়ে বিদ্রোহের মাসআলায় যে ফলাফলে পৌঁছেছেন তার সাথে থানভী রহিমাহুল্লাহ এর এ কথাগুলোর কোন সম্পর্ক নেই এবং তাঁর কথা থেকে এ ধরনের ফলাফল বের হওয়ার কোন সুযোগও নেই।

কাফের-মুরতাদ শাসক সম্পর্কে থানভী রহিমাহুল্লাহ এর উদ্ধৃতিগুলো:

হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এ তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ কুফরের ও ইরতিদাদের প্রকার উল্লেখ করে তার সাথে হাদীস ও ফিকহের উদ্ধৃতিগুলো উল্লেখ করেছেন। তাঁর উল্লেখ করা উদ্ধৃতিগুলো যথাক্রমে এই-

العبارة الثالثة: قال في شرح المقاصد: ينحل عقد الإمامة بما يزول به مقصود الإمامة، كالردة والجنون المطبق وصيرورته أسيرا لا يرجى خلاصه، وكذا بالمرض الذي ينسيه المعلوم وبالعمي والصمم والخرس، وكذا بخلعه نفسه لعجزه عن القيام بمصالح المسلمين، وإن لم يكن ظاهرا بل استشعره من نفسه، وعليه يحمل خلع الحسن نفسه. وأما خلعه بنفسه بلا سبب ففيه خلاف، وكذا في انعزاله بالفسق، والأكثرون على أنه لا ينعزل وهو المختار من مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وعن محمد روايتان، ويستحق العزل بالاتفاق. اهـ إمداد الفتاوى٥/١٣١

অনুবাদ: "তৃতীয় উদ্ধৃতি: শরহুল মাকাসেদের রচয়িতা বলেন, এমন কারণ পাওয়া গেলে ইমামুল মুসলিমীন হওয়ার দায়িত্ব থেকে অব্যহতি হয়ে যাবে যেসব কারণে ইমামুল মুসলিমীন হওয়ার উদ্দেশ্য ব্যহত হয়ে যায়। যেমন: মুরতাদ হয়ে যাওয়া, স্থায়ীভাবে পাগল হয়ে যাওয়া, শত্রুর হাতে এমনভাবে বন্দি হওয়া যে বন্দিদশা থেকে মুক্তি

পাওয়ার কোন আশা নেই। এমনিভাবে এমন অসুস্থতা যা সকল জানা বিষয়কে ভুলিয়ে দেয়। অন্ধত্ব, বধিরতা ও বোবা হয়ে যাওয়া। এমনিভাবে মুসলমানদের জরুরী চাহিদাগুলো পূরণ করতে অক্ষম হওয়ার কারণে রাষ্ট্রপ্রধান নিজে নিজে অব্যহতি গ্রহণ করা। তার অক্ষমতা যদি প্রকাশ্য বোঝা নাও যায়; বরং সে নিজে নিজে অনুভব করে। হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু যে নিজেকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন তাকে এ হিসাবেই ধরে নেয়া হবে। আর যদি কোন ইমামুল মুসলিমীন কোন কারণ ছাড়া নিজেকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে মতভেদ আছে। এমনিভাবে ফাসেক হওয়ার কারণে অব্যহতি করার ক্ষেত্রেও। অধিকাংশের অভিমত হচ্ছে, এ কারণে তার অব্যহতি হবে না। শাফেয়ী ও আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ এর মাযহাবে এটাই গ্রহণযোগ্য। এ সুরতে ইমাম মুহাম্মদ রহিমাহুল্লাহ থেকে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। বাকি সবার মতানুসারে তাতে অব্যহতি দেয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে।" -ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/১৩১

كما بسطه في أول المرتد من الدر المختار ورد المحتار، ولنقتصر على نقل بعض العبارة منه. قال في المسايرة: وبالجملة فقد ضم إلى التصديق بالقلب، أو بالقلب واللسان في تحقيق الإيمان أمور الإخلال بها إخلال بالإيمان اتفاقا، كترك السجود لصنم، وقتل نبي والاستخفاف به، وبالمصحف والكعبة.

وكذا مخالفة أو إنكار ما أجمع عليه بعد العلم به لأن ذلك دليل على أن التصديق مفقود .

ثم حقق أن عدم الإخلال بهذه الأمور أحد أجزاء مفهوم الإيمان فهو حينئذ التصديق والإقرار وعدم الإخلال بما ذكر بدليل أن بعض هذه الأمور، تكون مع تحقق التصديق والإقرار ، ثم قال ولاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة، وأفعال تصدر من المنتهكين لدلالتها على الاستخفاف بالدين كالصلاة بلا وضوء عمدا

بل بالمواظبة على ترك سنة استخفافا بها بسبب أنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم زيادة أو استقباحها كمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه أو إحفاء شاربه ا هـ

قلت : ويظهر من هذا أن ما كان دليل الاستخفاف يكفر به ، وإن لم يقصد الاستخفاف. إمداد الفتاوى ٥/١٢٩-١٣٠

অনুবাদ: "যেমন আদদুররুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতারে মুরতাদের বয়ানের শুরুতে বিস্তারিত বলেছেন। আমরা সেখান থেকে কিছু ইবারত উল্লেখ করব। মুসায়ারায় বলেছেন, মোটকথা ঈমান সাব্যস্ত হওয়ার জন্য অন্তর দিয়ে সত্যায়ন অথবা অন্তর ও যবানে সত্যায়নের সঙ্গে সে বিষয়গুলোকেও যুক্ত করেছেন যা সত্যায়নের পরিপন্থী হওয়ার কারণে সর্বসম্মতিক্রমে ঈমান পরিপন্থী। যেমন: মূর্তিপূজা ছাড়তে হবে, কোন নবীকে হত্যা করা ছাড়তে হবে এবং নবী, মুসহাফ ও কা'বার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ছাড়তে হবে।

এমনিভাবে শরীয়তের সর্বসম্মত কোন বিষয়কে জানার পরও তার বিরোধিতা করা বা তা অস্বীকার করা। কেননা এটা এ কথা প্রমাণ করে যে, এখানে তাসদীক-সত্যায়ন নেই।

এরপর তিনি এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন যে, এ বিষয়গুলোর দ্বারা ঈমানের মর্মের কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্থ না হওয়ার অর্থ হচ্ছে সেখানে তাসদীক-সত্যায়ন, স্বীকৃতি ও উল্লিখিত বিষয়গুলো দ্বারা ঈমান ক্ষতিগ্রস্থ না হওয়া। এর দলিল হচ্ছে, এ বিষয়গুলোর কোন কোনটি এমন যা তাসদীক-সত্যায়ন ও স্বীকৃতির সঙ্গে পাওয়া যায়। এরপর তিনি বলেছেন, অবজ্ঞার বিপরীত সম্মান প্রদর্শন ধর্তব্য করার কারণে হানাফী ওলামায়ে কেরাম অনেক শব্দ ও কাজের ভিত্তিতে তাকফীর করেছেন-কাফের বলেছেন, যে শব্দ ও আচরণগুলো বিদ্রুপকারী ও তুচ্ছতাচ্ছিল্যকারীদের থেকে প্রকাশ পায়। কেননা সে শব্দ ও আচরণগুলো অবজ্ঞাকে প্রমাণ করে। যেমন: ইচ্ছা করে অযু ছাড়া নামায পড়া। বরং সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনমূলক তা নিয়মিত তরক করা; এ কারণে যে, নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা অতিরিক্ত করেছেন, অথবা তাকে খারাপ মনে করার দ্বারা। যেমন কোন ব্যক্তি অপরকে নিন্দা করতে গিয়ে পাগড়ীর কিছু অংশ তার কণ্ঠের নিচে রাখল, অথবা মোচ লম্বা করা।

আমি বলি, এর দ্বারা বোঝা যায়, যে কথা-কাজ অবজ্ঞার আলামত বহন করে, তা প্রকাশ পাওয়ার দ্বারা কাফের বলা হবে। যদিও সে অবজ্ঞা উদ্দেশ্য না করে থাকে।" ইমদাদূল ফাতাওয়া ৫/১২৯-১৩০

জালেম-ফাসেক বিষয়ে থানভী রহিমাহুল্লাহ এর উদ্ধৃতিগুলো:

হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এ তৃতীয় প্রকারের আগে পরে জালেম শাসক ও ফাসেক শাসকের বিভিন্ন প্রকার ও সেগুলোর হুকুম উল্লেখ করেছেন এবং সে পক্ষে হাদীস ও ফিকহের উদ্ধৃতিও উল্লেখ করেছেন। তাঁর উল্লেখ করা সে উদ্ধৃতিগুলো যথাক্রমে এই-

العبارة الرابعة: وقال في المسايرة: وإذا قلد عدلا ثم جار وفسق لا ينعزل، ولكن يستحق العزل إن لم يستلزم فتنة. أهـ إمداد الفتاوى ١٣١/٥

অনুবাদ: "চতুর্থ ইবারত: মুসায়ারার মধ্যে বলেছেন, যদি কোন ন্যায়পরায়ণের হাতে দায়িত্ব ন্যাস্ত করে, এরপর সে জুলুম ও অপরাধ শুরু করে তাহলে সে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাবে না, তবে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে, যদি কোন ফিতনা সৃষ্টি না হয়।" - ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/১৩১

العبارة الأولى: في الدر المختار: باب الإمامة: يكره تقليد الفاسق ويعزل به إلا لفتنة. في رد المحتار ويعزل به أي بالفسق لو طرأ عليه، المراد أنه يستحق العزل كما علمت آنفا، ولذا لم يقل: ينعزل. اهـ إمداد الفتاوى ١٣١/٥

অনুবাদ: “প্রথম ইবারত: দুররে মুখতারে রয়েছে, বাবুল ইমামাহ: ফাসেকের আনুগত্য মাকরূহ্, ফাসেকীর কারণে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেয়া হবে, তবে ফিতনা সৃষ্টি হলে নয়। রাদ্দুল মুহতারে রয়েছে, যদি সে ফিসক শুরু করে তাহলে তার এ ফিসকের কারণে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে, যেমন ইতিপূর্বে তুমি জানতে পেরেছ। আর সে কারণেই ينعزل ‘নিজে নিজে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাবে’ বলেননি।” - ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/১৩১

العبارة الثانية: في الدر المختار: باب البغاة: فإن بايع الناس الإمام ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه عن قهرهم لا يصير إماما، فإذا صار إماما فجار لا ينعزل إن كان له قهر وغلبة لعوده بالقهر فلا يفيد، وإلا ينعزل به، لأنه مفيد. خانية. وتمامه في كتب الكلام. في رد المحتار قوله: فلا يفيد أي لا يفيد عزله. قوله: وإلا ينعزل به أي إن لم يكن له قهر ومنعة ينعزل به أي بالجور.اهـ إمداد الفتاوى ١٣١/٥

অনুবাদ: “তৃতীয় ইবারত: দুররে মুখতারে রয়েছে, বাবুল বুগাত: যদি মানুষ ইমামুল মুসলিমীনের হাতে বায়আত হয়, কিন্তু সে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম হওয়ার কারণে তাদের মাঝে তার হুকুম প্রয়োগ হয় না, এমন হলে সে ইমামুল মুসলিমীন সাব্যস্ত হবে না। অতঃপর সে ইমামুল মুসলিমীন হয়ে জুলুম শুরু করলে, তার যদি নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য থাকে তাহলে সে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাবে না; কারণ তার নিয়ন্ত্রণশক্তি ফিরে এসেছে, সুতরাং ক্ষমতাচ্যুত হয়ে কোন লাভ নেই। আর তা না হলে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাবে; কেননা তা ফায়দাজনক। খানিয়াহ। এর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আকীদার কিতাবে রয়েছে। রাদ্দুল মুহতারে রয়েছে: তাঁর কথা ‘কোন ফায়দা দেবে না’ অর্থাৎ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে কোন ফায়দা নেই। আর তাঁর কথা ‘নচেত সে কারণে সে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাবে’ অর্থাৎ যদি তার নিয়ন্ত্রণশক্তি ও প্রতিরোধশক্তি না থাকে, তাহলে সে কারণে অর্থাৎ জুলুমের কারণে সে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাবে।” -ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/১৩১

العبارة الخامسة: وفي المواقف وشرحه: إن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه، مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال المسلمين وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلالها، وإن أدى خلعه إلى فتنة احتمل أدنى المضرتين. هـ إمداد الفتاوى ١٣١/٥

অনুবাদ: "পঞ্চম ইবারত: মাওয়াকিফ ও শরহুল মাওয়াকিফ এ রয়েছে, সাধারণ মুসলমানরা ইমামুল মুসলিমীনকে ক্ষমতাচ্যুত ও অপসারণ করতে পারবে, যদি অপসারণ করার মত কোন কারণ পাওয়া যায়। যেমন তার মাঝে এমন কিছু পাওয়া গেল যার দরুন মুসলমানদের সমস্যা হয় এবং দ্বীনের বিষয়াদি অবনতির দিকে ধাবিত হয়। যেমনিভাবে মুসলমানদেরই দায়িত্ব হচ্ছে, দ্বীনের বিষয়গুলো সুশৃংখল ও কার্যকরী করার জন্য ইমামুল মুসলিমীন নিয়োগ করা এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করা। আর যদি তাকে অপসারণ করতে গেলে ফেতনা দেখা দেয়, তাহলে দুই ক্ষতির সহজটিকে গ্রহণ করবে।" -ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/১৩১

এ উদ্ধৃতিগুলোর দাবি

আমরা দেখলাম এবং আশাকরি বুঝতে পেরেছি যে, হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর লেখায় কাফের-মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধান ও তার উদ্ধৃতিগুলো এবং ফাসেক ও যালেম রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধান ও তার উদ্ধৃতিগুলো সম্পূর্ণই আলাদা ও সুস্পষ্ট, যার মাঝে অস্পষ্টতা সৃষ্টি করার কোন সুযোগ নেই। বিশেষ করে কাফের-মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধানকে অপসারণের ক্ষেত্রে ফেতনা সৃষ্টি হওয়া না হওয়া বিষয়ক কোন কথা হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর নিজের বক্তব্যেও নেই এবং তিনি যেসব উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন সেগুলোতেও নেই। রাষ্ট্রপ্রধানকে অপসারণ করতে গেলে যদি ফেতনার আশংকা থাকে, তাহলে তাকে অপসারণ করবে কি করবে না -এ আলোচনা শুধুই জালেম ও ফাসেক শাসকের ক্ষেত্রে আলোচিত হয়েছে। থানভী রহিমাহুল্লাহ এর ইবারতেও এবং তাঁর উল্লেখ করা উদ্ধিতিগুলোতেও।

দুর্ভাগ্যক্রমে দু'টির মাঝে তালগোল পাকিয়ে কাফের-মুরতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধান ও তার উদ্ধৃতিগুলোকে ফাসেক ও জালেম রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধান ও উদ্ধৃতির মধ্যে গুলিয়ে ফেলে, কাফের-মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধানকে বেমালুম ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সবার হুকুমকে পরস্পরে একাকার করে দিয়ে যালেম-ফাসেক রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধান ও তার উদ্ধৃতিগুলোকে ব্যাপকভাবে প্রচার প্রসার করার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলাফল নিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে, কোন অবস্থাতেই বিদ্রোহ করা যাবে না। কাফের-মুরতাদ, জালেম-ফাসেক কারো বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করা যাবে না। এবং এর কারণ হিসাবে সম্ভাব্য এমন একটি ফিতনার কথা বলা হচ্ছে, যে ফিতনার আশংকা মানব মন থেকে কখনো যাবে না। কিন্তু একটি বায়বিয় শর্তের ভিত্তিতে একটি বায়বিয় আশংকাকে পুঁজি করে কাফের-মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার বিধানকে চিরতরে মাটিচাপা দিয়ে দেয়া হয়েছে।

এ কাজগুলো যাদের কলমে অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আর যারা ইচ্ছা করেই কাজগুলো করেছে, আল্লাহ তাদেরকে তাওবা করার তাওফীক দান করুন।

ফলাফল:

আমরা এখানে দু'টি ফলাফল দেখাব ইনশাআল্লাহ। একটি হচ্ছে হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য ও তাঁর উদ্ধৃতিগুলোর ফলাফল। আরেকটি হচ্ছে হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর নামে যে দু'টি শর্তকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে তার ফলাফল।

হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য ও তাঁর উল্লেখ করা উদ্ধৃতিগুলো সম্পর্কে আমরা পাঠকবর্গকে বলতে চাই, তাঁর নিজের বক্তব্যগুলো এবং তাঁর উল্লেখ করা উদ্ধৃতিগুলো আপনারা বার বার দেখুন। তাঁর নিজের কিতাব থেকে দেখুন। কাফের ও মুরতাদ শাসকের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার বিষয়ে তিনি একটি শর্ত উল্লেখ করেছেন, আর তা হচ্ছে বিদ্রোহের সামর্থ্য থাকা। বিদ্রোহ করতে গেলে ফিতনা সৃষ্টি হবে কি না -এসব বিষয়ে চিন্তা করার কথা বলা হয়নি। এমনিভাবে কাফের-মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিষয়ে তিনি যে উদ্ধৃতিগুলো উল্লেখ করেছেন, সেগুলোতে কাফের-মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ক্ষেত্রে ফিতনার কোন আশংকাকে বিবেচনায় রাখা হয়নি। এমন কোন আশংকার উল্লেখই নেই।

অতএব তাঁর বক্তব্য এবং তাঁর দেয়া উদ্ধৃতিগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি, মুসলমানদের জন্য কাফের-মুরতাদ শাসকের অধীনে জীবন যাপন করার চাইতে বড় আর কোন ফেতনা নেই, যে ফেতনা থেকে বাঁচার ভয়ে কাফের-মুরতাদ শাসকের অধীনস্থতাকে মেনে নিতে হবে।

পক্ষান্তরে হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর নামে যে বায়বীয় শর্তটিকে প্রচার করার চেষ্টা করা হয়েছে, অর্থাৎ অন্য কোন ফেতনার অশংকা থাকলে কাফের-মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে মুসলমানরা বিদ্রোহ করবে না -এ শর্তের অনিবার্য ফলাফল হিসাবে আমরা বলতে পারি, কাফের-মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিষয়ে শরীয়তের যে সিদ্ধান্ত, উম্মত যে বিষয়টিকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছে, শরীয়তের সে সিদ্ধান্তকে এবং একটি অকাট্য ফরয দায়িত্বকে আটকে দেয়া হয়েছে এমন একটি বায়বীয় শর্ত দিয়ে, কুরআনে, হাদীসে, ফিকহে ও উম্মতের আমলের মাঝে যে শর্তের কোন অস্তিত্ব নেই।

সংশ্লিষ্ট পক্ষ থেকে বলতে বলতে এতদূর পর্যন্ত বলে ফেলা হয়েছে যে, কাফের-মুরতাদ শাসককে অপসারণ করার পর যদি মুসলমানরা পরস্পরে ক্ষমতার লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে কাফের-মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না। সংশ্লিষ্ট পক্ষের এ দাবির আলোকে আমরা বলতে পারি, তাদের দৃষ্টিতে কাফের-মুরতাদ শাসকের অধীনে মুসলামানরা জীবন যাপন করা কোন ফেতনার বিষয় নয়। আরো এক ধাপ এগিয়ে, এ পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট করে এ কথাও বলা

হয়েছে যে, একটি দেশ যদি গায়রুল্লাহর আইনেও চলে তবু তা দারুল ইসলাম হিসাবে বহাল থাকবে।

তাহলে ফলাফল দাঁড়াচ্ছে, দেশের আইন গায়রুল্লাহর আইন, দেশের শাসক কাফের-মুরতাদ। এমন অবস্থায় বিদ্রোহ করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ এগুলো বড় কোন ফেতনা নয়। শিরক, শিরকের আইন ও শিরকের শাসন কোনটিই বড় ফেতনা নয়। তাহলে বড় ফেতনা কি?! এটি একটি প্রশ্ন।

শরীয়তের সিদ্ধান্ত

এ পর্যায়ে এসে মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিষয়ে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতির মাধ্যমে শরীয়তের সিদ্ধান্তটি আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। একটি উদ্ধৃতি হচ্ছে কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ এর, আরেকটি হচ্ছে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ এর।

কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ বলেন-

قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها قال وكذلك عند جمهورهم البدعة قال وقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لأنه متأول.

قال القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها

ويفر بدينه. شرح النووي على صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية

অনুবাদ: কাজি ইয়ায রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ওলামায়ে কেরামের ইজমা হল নেতৃত্ব (ইমামাহ) কখনো কাফিরের হাতে অর্পণ করা যাবে না। আর যদি তার (ইমাম) থেকে কুফর প্রকাশিত হয় তবে সে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাবে। এমনিভাবে সে যদি নামায কায়েম করা এবং নামাযের দিকে ডাকা ছেড়ে দেয়। তিনি বলেন, এমনিভাবে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে বিদআতের কারণেও সে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাবে। তিনি বলেন, বসরার ওলামায়ে কেরামের কেউ কেউ বলেছেন, তার ইমামত সাব্যস্ত হবে এবং তা বহাল থাকবে; কেননা সে তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষে করে।

কাযী ইয়ায বলেন, সুতরাং যদি সে কুফর করে এবং শরীয়াহ পরিবর্তন করে অথবা তার পক্ষ থেকে কোন বিদআত প্রকাশিত হয়, তবে সে নেতৃত্বের অধিকার হারিয়ে ফেলবে এবং তার আনুগত্য পাবার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। তখন মুসলিমদের জন্য আবশ্যক হয়ে যাবে তার বিরোধিতা করা, বিদ্রোহ করা, তার পতন ঘটানো এবং তার স্থলে একজন ন্যায়পরায়ণ ইমামকে বসানো; যদি তারা (মুসলিমরা) সক্ষম হয়। যদি একটি দল (তাইফা) ব্যতীত অন্যান্য মুসলিমদের পক্ষে এটা করা সম্ভব না হয়, তবে যে দলের (তাইফা) সক্ষমতা আছে তাদের জন্য এই কাফিরের (শাসকের) পতন ঘটানো অবশ্য কর্তব্য। আর যদি শাসক বিদআতী হয় তবে, তা ওয়াজিব হবে না, তবে যদি তারা (তাইফা) সক্ষম হবে বলে মনে করে তাহলে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করবে। আর যদি কেউই সক্ষম না হয় এবং এ ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়ে যায়, তবে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব নয়, তবে তখন মুসলিমদের সেই ভূমি থেকে অন্য কোথাও হিজরত করতে হবে, নিজেদের দ্বীনের সংরক্ষণের জন্য।”
-শারহুন নববী আলা সাহীহি মুসলিম ১২/২২৯

ইমাম ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন-

وقد تقدم البحث في هذا الكلام على حديث عبادة في الأمر بالسمع والطاعة إلا أن تروا كفرا بواحا بما يغني عن إعادته وهو في كتاب الفتن وملخصه: إنه ينعزل بالكفر إجماعا فيجب على كل مسلم القيام في ذلك فمن قوي على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه الإثم ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ١٢٣/١٣، المكتبة السلفية

অনুবাদ: "উবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর হাদীস الأمر بالسمع والطاعة الا أن تروا كفرا بواحا এর উপর এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যা পুনরায় উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তা করা হয়েছে কিতাবুল ফিতানে, যার সারকথা হচ্ছে, ইজমা তথা ঐক্যমতে শাসক কুফরী করলে সে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাবে। তখন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে। তখন যে তা করতে সক্ষম হবে সে সাওয়াব পাবে, যে মুনাফিকী করবে সে গুনাহগার হবে, আর যে অক্ষম হবে তার উপর সে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র হিজরত করা ওয়াজিব।" -ফাতহুল বারী শরহু সাহীহিল বুখারী, হাফেয ইবনে হাজার, কিতাবুল আহকাম, باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية ১২৩/১৩,

কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ ও হাফেয ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্যগুলোতে একথা স্পষ্ট যে, রাষ্ট্রপধান কাফের হয়ে গেলে মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। বিদ্রোহ করা তাদের প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। বিদ্রোহ করতে সক্ষম না হলে তারা কাফের রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে বসবাস না করে অনত্র হিজরত করে চলে যাবে। এ দুই কাজের বাইরে যে কাজটি রয়েছে তা হচ্ছে মুনাফিকী। যারা বিদ্রোহও করবে না এবং হিজরতও করবে না, তারা মুনাফিক, মুদাহিন, কাফেরের চাটুকার ও পদলেহী।

হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর তিনটি কথা: সামর্থ্য, সুস্পষ্ট কুফর ও সুস্পষ্ট প্রকাশ

কাফের-মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ক্ষেত্রে হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ তিনটি বিষয় আলোচনা করেছেন।

১. বিদ্রোহের জন্য বিদ্রোহকারীদের সামর্থ্য থাকতে হবে।

২. শাসকের কুফর সুস্পষ্ট কুফর হতে হবে।

৩. শাসক থেকে কুফরের প্রকাশটা নিশ্চিত হতে হবে।

আমরা এ তিনটি বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব, যাতে কেউ এগুলোকে পুঁজি করে কোন অসদুদ্দেশ্য হাসিল করতে না পারে এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

সামর্থ্য:

এ বিষয়ে প্রথম কথা হচ্ছে, শরীয়তের একটি বিধানও এমন নেই যা সামর্থ্য না থাকলেও করতে হবে। প্রত্যেকটি বিধান পালন করা তখনই ওয়াজিব যখন সে বিধান পালন করার মত সামর্থ্য থাকবে। সামর্থ্যের বাইরে কোন আমল আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর ফরয করেন না। প্রশ্ন হচ্ছে, জিহাদ, কিতাল, বিদ্রোহ, প্রতিরোধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সামর্থ্যের শর্তটিকে এত বেশি চর্চা করা হয়, যা অন্য কোন আমলের ক্ষেত্রে করা হয় না। বরং জিহাদ, বিদ্রোহ, প্রতিরোধ ইত্যাদির আলোচনা আসলে শর্তটির উল্লেখ করেই এ দায়িত্ব থেকে মুক্তির ফায়সালা হয়ে যায়, কিন্তু বাস্তবে সামর্থ্য আছে কি না? তা দেখারও সুযোগ দেয়া হয় না। তাই একটু খতিয়ে দেখা দরকার, এসব ক্ষেত্রে শরীয়তের বিচারে সামর্থ্যের মানদন্ড কী? দেড়শত কোটি মুসলমানের পৃথিবীতে কেন মুসলমানরা সামর্থ্যহীন? এবং সামর্থ্য নেই বলতে কেন আমাদের দায়িত্বশীলগণের মুহূর্তমাত্র দেরি হয় না, বিষয়টি একটু খতিয়ে দেখতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।

সামর্থ্যের মাপকাঠি

সামর্থ্য বিষয়ক আলোচনার সুবাদে আমাদের সামনে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাওয়া দরকার।

এক. সামর্থ্যের জনবল।

দুই. সামর্থ্যের অর্থবল।

তিন. সামর্থ্যের অস্ত্রবল।

চার. সামর্থ্যের কৌশলবল।

পাঁচ. সামর্থ্য না থাকলে করণীয় কী?

কুরআন, হাদীসের আলোকে ফিকহ-ফাতওয়ার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিষয়গুলো পরিস্কার হয়ে গেলে আশা করি এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার ধুম্রজাল সৃষ্টি করার আর সুযোগ থাকবে না।

এ বিষয়ে আয়াত হাদীস এবং ফুকাহা, মুহাদ্দিসীন ও মুফাসসিরীনের বক্তব্যগুলো উল্লেখ করার আগে ছোট্ট একটি ভূমিকা তুলে ধরছি। দলিলগুলো বোঝার জন্য যা সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

একটি ছোট্ট ভূমিকা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী জীবন শেষ হয়ে যখন মাদানী জীবন শুরু হয় এবং মাদানী জীবনের কিছু অংশ পার হয় তখন মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয করা হয়। প্রতিরোধ এবং আক্রমণ তাদের উপর ফরয করা হয়। বলাবাহুল্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশ বছর মাদানী জীবনে 'দিফায়ী' বা প্রতিরোধমূলক জিহাদ ও 'ইকদামী' আক্রমণাত্মক জিহাদ দু'টি বার

বারই সংঘটিত হয়েছে। অসংখ্য জিহাদের কোন কোনটি দিফায়ী ছিল, আর কোন কোনটি ইকদামী ছিল সে বিশ্লেষণে আমরা এখন যাচ্ছি না।

বদর যুদ্ধ থেকে শুরু করে জাইশে উসামা (রাযি.) পর্যন্ত যত জিহাদ হয়েছে এবং যত জিহাদের জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে আদেশ করেছেন সবগুলো জিহাদের প্রস্তুতি ভূমি, আশ্রয় ভূমি ও পরিচালনা ভূমি ছিল সর্বোচ্চ জাযিরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপ।

সুতরাং বদর যুদ্ধ থেকে জাইশে উসামা (রাযি.) পর্যন্ত যতগুলো দিফায়ী ও ইকদামী জিহাদ মুসলমানদের উপর ফরয হয়েছিল সে জিহাদগুলো ফরয হওয়া অবস্থায় পুরো পৃথিবীর অবস্থা, মুসলমানদের প্রতি বিশ্বকুফরী শক্তির বিদ্বেষের অবস্থা ও মুসলমানদের যে পরিস্থিতিগুলো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না সেগুলো যথাক্রমে এই-

১. মুসলমানদের সংখ্যা ও ভূমি মদীনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা অবস্থায়ও জিহাদ ফরয হয়েছিল এবং আরব উপদ্বীপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা অবস্থায়ও জিহাদ ফরয হয়েছিল।

২. মদীনার বাইরে পুরো পৃথিবী যখন মুসলমানদের শত্রু তখনও জিহাদ ফরয হয়েছিল এবং জাযিরাতুল আরবের বাইরে পুরো পৃথিবী যখন মুসলমানদের শত্রু তখনও জিহাদ ফরয হয়েছিল।

৩. রাসূলে আরাবীর মদীনার দশ বছর জীবনে কখনো নিয়মতান্ত্রিক সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত ছিল না। জিহাদের ময়দানে যাওয়ার আগে পরে জিহাদের ফরয দায়িত্ব পালনকারীদের কেউ ইলম শিখছেন, কেউ শেখাচ্ছেন, কেউ ব্যবসা করছেন, কেউ কৃষি কাজ করছেন, কেউ দিনমজুর হিসাবে খাটছেন, কেউ উট বকরির খামার নিয়ে আছেন, কেউ রাখাল হিসাবে কাজ করছেন। জিহাদের ঘোষণা আসার সাথে সাথে এঁরা সবাই মুজাহিদ, এঁরা সবাই যোদ্ধা।

৪. সাহাবায়ে কেরাম যখন জিহাদের ফরয দায়িত্ব পালন করছেন তখন রাসূলে আরাবীর কাছে নিয়মতান্ত্রিক কোন সৈন্যবাহিনী ছিল না, কিন্তু বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর কাছে নিয়মতান্ত্রিক সৈন্যবাহিনী ছিল এবং লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা প্রস্তুত ছিল।

৫. রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন জিহাদ ফরয হয় তখন তাঁর কাছে কোন অস্ত্রের মজুদ ছিল না। নিজ নিজ পেশায় ও কাজে ব্যস্ত মুসলমানদের নিজস্ব সংগ্রহ ও নিজস্ব পাথেয়গুলো নিয়ে তাঁদের উপর অর্পিত ফরয দায়িত্ব তাঁরা পালন করতেন। আর যাদের সংগ্রহে ও সামর্থ্যে উপাদান বেশি থাকত তাঁরা অন্যদেরকে সহযোগিতা করতেন।

৬. আরবের মুষ্টিমেয় মুসলমানদেরকে আরব-অনারব তথা পৃথিবীর সকল কুফরী শক্তি তাদের পার্থিব স্বার্থের জন্যও শত্রু মনে করত এবং তাদের বাতিল ও ভ্রষ্ট ধর্মগুলোর ধর্মীয় স্বার্থের জন্যও শত্রু মনে করত।

৭. মদীনার মুষ্টিমেয় মুসলমানদের উপর যখন জিহাদ ফরয হয়, তখন পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারকারী কুফরী শক্তির পদচারণা জাযিরাতুল আরবের উপকণ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে কোন শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে তার খবর রাখত এবং তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও নিত।

৮. আরবের মুষ্টিমেয় মুসলমানদের উপর যখন জিহাদ ফরয হয়, তখন মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বিশ্বের কুফরী শক্তিগুলো পরস্পরে একে অপরকে সহযোগিতা করত। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করত। তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা তারা ব্যয় করত।

৯. মদীনা ও আরবের মুসলমানদের উপর যখন জিহাদ ফরয হয়, তখন তাঁদের অস্ত্রের পরিমাণের তুলনায় বিশ্বকুফরী শক্তির মজুদ অস্ত্রের পরিমাণ শুধু শত গুণ বা হাজার গুণ ছিল এমন নয়; বরং মুসলমানদের অস্ত্রের তুলনায় তাদের অস্ত্রের পরিমাণের কোন সীমা পরিসীমা ছিল না।

১০. মুসলমানদের উপর যখন জিহাদ ফরয হয়, তখন তাদের মাঝে মুনাফিকের সংখ্যাও একেবারে নগন্য ছিল না। মুনাফিকদের এমন ভয়াবহ আচরণ ছিল যে, যুদ্ধের মুখোমুখী হতে গিয়েও তারা পিছু হটে চলে এসেছে। কিন্তু এরপরও জিহাদের ফরয বিধান তার আপন অবস্থায় ছিল।

১১. এমন মুসলমানদের উপরও জিহাদের বিধান ফরয ছিল যাঁরা ঈমান আনার পর তখনো আমলগুলো শিখে শেষ করেননি। আমলগুলো বাস্তবায়ন করা শুরু করেননি।

১২. এমন মুসলমানদের উপরও জিহাদের বিধান ফরয ছিল, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের উপর বিভিন্ন দন্ডবিধি প্রয়োগ করেছিলেন।

১৩. মদীনার দশ বছর জীবনে যখন জিহাদ ফরয হয়েছে তখনও পৃথিবীতে গোয়েন্দাগিরির ব্যাপক প্রচলন ছিল। শত্রুরা বিভিন্নভাবে মুসলমানদের প্রস্তুতির খবরাখবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করত।

১৪. খন্দকের যুদ্ধে শত্রু যখন মাদীনার চতুর্দিক ঘেরাও করে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করেছে, তখনও মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয ছিল, আবার মুসলামানরা যখন পনের দিনের সফরের দূরত্ব অতিক্রম করে তাবুকে গিয়েছিলেন এবং তৎকালীন বিশ্বের পরাশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়েছিলেন, তখনও মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয ছিল।

১৫. বদর যুদ্ধের তিন শত তের জনের উপরও জিহাদ ফরয ছিল, ফাতহে মক্কার দশ-বার হাজারের উপরও জিহাদ ফরয ছিল এবং তাবুকের যুদ্ধের ত্রিশ হাজারের উপরও জিহাদ ফরয ছিল।

এ কয়েকটি সর্বসম্মত বিষয় সামনে রেখে আমরা আয়াত, হাদীস ও ফিকহে ইসলামীর আলোকে জিহাদের সামর্থ্য নিয়ে কিছু আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

সামর্থ্যের আলোচনা আসলে সাধারণত যে বিষয়গুলো আমাদেরকে আলোচনা নিয়ে সামনে বাড়তে দেয় না সেগুলো হচ্ছে:

এক. সামর্থ্যের জনবল।

দুই. সামর্থ্যের অর্থবল।

তিন. সামর্থ্যের অস্ত্রবল।

চার. সামর্থ্যের কৌশলবল।

এক. সামর্থ্যের জনবল

সামর্থ্যের এ অংশটি খুব স্পষ্ট। জিহাদের বিধানের শুরুর দিকে জনবলের হিসাব ছিল, প্রতি দশজন কাফেরের বিপরীতে একজন মুসলমান থাকলে তার জন্য দশজন কাফেরের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া ফরয। দুইশত কাফেরের বিরুদ্ধে বিশজন মুসলমানের জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়া ফরয ছিল। এক পর্যায়ে এ বিধানটি মানসূখ হয়ে দু'জন কাফেরের বিরুদ্ধে একজন মুসলমানের লড়াই চালিয়ে যাওয়াকে ফরয করা হয়েছে এবং দুইশত কাফেরের বিরুদ্ধে একশত মুসলমানের লড়াই চালিয়ে যাওয়াকে ফরয করা হয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (٦٥) الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (٦٦) سورة الأنفال

অনুবাদ: "হে নবী, তুমি মুমিনদের যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ কর, তোমাদের মধ্যে বিশ জন লোক যদি ধৈর্য্যশীল হয় তাহলে তারা দুশ লোকের উপর বিজয়ী হবে, আবার তোমাদের মাঝে (এমন লোকের সংখ্যা) যদি একশ হয় তাহলে তারা এমন এক হাজার লোকের উপর জয় লাভ করবে যারা কুফরী করেছে। এর কারণ হচ্ছে, তারা এমন জাতি যারা (আল্লাহর শক্তি সম্পর্কে) কিছুই বোঝে না। এখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর বিধানকে হালকা করে দিয়েছেন। কারণ তিনি জানেন, তোমাদের মাঝে কিছু দুর্বলতা রয়েছে। অতএব তোমাদের থেকে যদি একশত ধৈর্য্যশীল মানুষ থাকে তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় তারা দুইশতর বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে, আর যদি তোমরা এক হাজার ধৈর্য্যশীল হও তাহলে তাদের দুই হাজারের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। আর আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথেই আছেন।" -সূরা আনফাল ০৮:৬৫-৬৬

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: خير الصحابة أربعة و خير السرايا أربعمائة و خير الجيوش أربعة ألف و لن يغلب إثنا عشر ألفا من قلة .

صحيح ابن خزيمة المتوفى سنة ٣١١هـ، كتاب المناسك، باب استحباب مصاحبة الأربعة في السفر، ١٢١٢/١، رقم الحديث : ٢٥٣٨، المكتب الإسلامي، تحقيق الدكتور مصطفى الأعظمي، قال الأعظمي: إسناده صحيح

অনুবাদ: "ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সফরসঙ্গী হিসাবে চারজন সর্বোত্তম, একটি কোম্পানী ও ব্রিগেডের জন্য চারশত সৈন্য সর্বোত্তম, একটি সেনাবাহিনীর জন্য চার হাজার সৈন্য সর্বোত্তম। আর সৈন্য সংখ্যা যদি বার হাজার হয়ে যায়, তাহলে সৈন্যস্বল্পতার কারণে তারা কখনো

হেরে যাবে না।" -সহীহ ইবনে খুযাইমা, কিতাবুল মানাসিক, باب استحباب مصاحبة الأربعة في السفر হাদীস নং-২৫৩৮ (হাদীসটির বর্ণনাসূত্র সহীহ।)

এ দু'টি আয়াত ও হাদীসের আলোকে ইমাম সারাখসী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৪৮৩ হি:) বলেন-

والفرار من الزحف من الكبائر على ما قال صلى الله عليه وسلم: "خمس من الكبائر لا كفارة فيهن" وذكر في الجملة الفرار من الزحف وقال: "إن من أعظم الموبقات الشرك بالله وأكل مال اليتيم والتولي يوم القتال وقذف المحصنات" ثم إن كان عدد المسلمين مثل نصف عدد المشركين لا يحل لهم الفرار منهم.

وكان الحكم في الابتداء أنهم إذا كانوا مثل عشر المشركين لا يحل لهم أن يفروا كما قال الله تعالى: { إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ } الأنفال :٦٢ ومن خبر الله أنه غالب فليس له أن يفر ثم خفف الأمر فقال: { الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ } إلى قوله: { فإِن يَكُن مِّنكُمْ مأة صَابِرُة يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ } الأنفال :٦٦ وهذا إذا كان بهم قوة القتال بأن كانت معهم الأسلحة فأما من لا سلاح له فلا بأس بأن يفر ممن معه السلاح وكذلك لا بأس بأن يفر ممن يرمي إذا لم يكن معه آلة الرمي ألا ترى أن له أن يفر من باب الحصن ومن الموضع الذي يرمى فيه بالمنجنيق لعجزه عن المقام في ذلك الموضع.

وعلى هذا لا بأس بأن يفر الواحد من الثلاثة، إلا أن يكون المسلمون اثني عشر ألفاً كلمتهم واحدة فحينئذ لا يجوز لهم أن يفروا من العدو وإن كثروا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لن يغلب اثنا عشر ألفاً عن قلة" ومن كان غالباً فليس له أن يفر. شرح السير الكبير

للسرخسي المتوفى سنة ٤٨٣هـ، باب الفرار من الزحف ٨٩/١، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان

অনুবাদ: "যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া কবিরা গুনাহগুলোর একটি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পাঁচটি বিষয় কবিরা গুনাহ যার কোন ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়'। সে পাঁচটির মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়াকেও উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, 'সবচাইতে ধ্বংসাত্মক গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা, এতিমের মাল খাওয়া, যুদ্ধের দিন পালিয়ে যাওয়া এবং সতী নারীকে (যিনার) অপবাদ দেয়া'। সুতরাং মুসলমানদের সংখ্যা যদি মুশরিকদের সংখ্যার অর্ধেক পরিমাণ হয় তাহলে তাদের জন্য পালিয়ে যাওয়া জায়েয নেই।

শুরুতে বিধান ছিল, মুসলমানরা মুশরিকদের দশ ভাগের এক ভাগ হলে তাদের জন্য পালিয়ে যাওয়া জায়েয নেই। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, *যদি তোমাদের থেকে বিশজন ধৈর্য্যশীল থাকে তাহলে তারা দুইশত এর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করবে।* (সূরা আনফাল ৬২) আর যার ব্যাপারে আল্লাহ জানিয়েছেন যে, সে বিজয়ী হবে তার জন্য পালিয়ে যাওয়া জায়েয নেই। এরপর বিধানটিকে হালকা করেছেন এবং বলেছেন, *'এখন আল্লাহ তোমাদের থেকে হালকা করে দিয়েছেন'* এ পর্যন্ত বলেছেন, *'যদি তোমাদের থেকে একশত ধৈর্য্যশীল থাকে তাহলে তারা দুইশত এর বিরুদ্ধে জয় লাভ করবে'।* (সূরা আনফাল ৬৬) আর এটা হচ্ছে যখন তাদের লড়াই করার মত শক্তি থাকবে। অর্থাৎ তাদের সঙ্গে অস্ত্র থাকবে। আর যার সাথে অস্ত্র থাকবে না সে এমন ব্যক্তি থেকে পালিয়ে যেতে সমস্যা নেই যার সাথে অস্ত্র আছে। এমনিভাবে এমন ব্যক্তি থেকে পালিয়ে যেতে কোন সমস্যা নেই যে নিক্ষেপ করছে, যখন তার কাছে নিক্ষেপ করার মত ব্যবস্থা থাকবে না। দেখ না! দুর্গের দরজা থেকে পালিয়ে যাওয়াও জায়েয আছে এবং এমন জায়গা থেকেও পালিয়ে যাওয়া জায়েয আছে যেখানে মিনজানিক দিয়ে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। কেননা সে সেখানে অবস্থান করতে সক্ষম নয়।

এর আলোকেই তিন জনের সামনে থেকে একজন পালিয়ে গেলে কোন সমস্যা নেই। তবে মুসলমানের সংখ্যা যদি বার হাজার হয়ে যায়, যারা একমতের উপর আছে। তখন তাদের জন্য শত্রু থেকে পালিয়ে যাওয়া জায়েজ নেই, শত্রুসংখ্যা যদি বেশিও হয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বার হাজার কখনো সংখ্যাস্বল্পতার কারণে পরাজিত হবে না'। আর যারা বিজয়ী হবে তাদের জন্য পালিয়ে যাওয়া জায়েয নেই।" -শারহুস সিয়ারিল কাবীর, সারাখসী (মৃ:৪৮৩হি:), বাবুল ফিরার মিনায যাহাফ ১/৮৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

কামালুদ্দীন দামীরী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৮০৮হি:) বলেন-

وحكى القرطبي في (تفسيره) أنهم إذا بلغوا اثني عشر ألفًا حرم الانصراف وإن زاد الكفار على مثليهم عند جمهور العلماء, منهم: مالك وأبو حنيفة وداوود؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لن يغلب اثنا عشر ألفًا من قلة) , وأنهم جعلوا ذلك مخصصًا للآية. النجم الوهاج في شرح المنهاج، للإمام العلامة المتقن المحدث الفقيه اللغوي كمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدميري المتوفى ٨٠٨هـ، كتاب السير

অনুবাদ: "কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, জুমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে মুসলিম যোদ্ধার সংখ্যা যখন বার হাজারে পৌঁছে যাবে, তখন তাদের জন্য ফিরে আসা হারাম। যদিও কাফেরদের সংখ্যা তাদের চাইতে দ্বিগুণের বেশি হয়। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন মালেক, আবু হানীফা ও দাউদ রাহিমাহুমুল্লাহ। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বার হাজার সংখ্যাস্বল্পতার কারণে কখনো হেরে যাবে না'। এসকল ওলামায়ে কেরাম এ হাদীসের আলোকে আয়াতের হুকুম থেকে (বার হাজারের ক্ষেত্রে) এ হুকুমকে খাস ধরে নিয়েছেন।

কুরআনের আয়াত, হাদীস এবং এ দুয়ের আলোকে ফিকহে ইসলামীর বক্তব্য তথা একজন হানাফী ইমামের বক্তব্য থেকে আমরা যে কথাগুলো পেলাম তা যথাক্রমে-

১. সামর্থ্যের ক্ষেত্রে জনবলের হিসাব হচ্ছে, মুসলমান যোদ্ধাদের বিপরীতে যদি অমুসলিম যোদ্ধা দ্বিগুণ হয়, তবু জিহাদ করা ফরয এবং জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে আসা জায়েয নেই। শত্রুসৈন্য দ্বিগুণের চাইতে বেশি হলে সংখ্যাগত বিবেচনায় পালিয়ে আসা জায়েয আছে।

২. সংখ্যার বিধানটি কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে, কারণ এটাই শেষ বিধান যাকে মানসূখ-রহিত করে আর কোন বিধান আসেনি।

৩. পরবর্তী উম্মতের বিভিন্ন রকমের দুর্বলতা ও সীমবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ সংখ্যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

৪. মুসলমানদের সংখ্যা বার হাজার হয়ে যাওয়ার পর, শত্রুসংখ্যা যাই হোক তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। পালিয়ে যাওয়া জায়েয নেই।

৫. এমন কোন পরিস্থিতি যদি এসে যায় যে, কোন নিরস্ত্র মুসলমান সশস্ত্র শত্রুর সামনে পড়ে গেছে, তাহলে তার জন্য পালিয়ে আসা জায়েয আছে।

৬. ইমাম আবু হানীফা, মালেক রহিমাহুল্লাহ সহ জুমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, মুসলমানদের সংখ্যা বার হাজারে পৌঁছে গেলে শত্রুসংখ্যা দ্বিগুণ হোক বা তার চাইতে বেশি হোক সর্বাবস্থায় মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

দুই. সামর্থ্যের অর্থবল

সামর্থ্যের ক্ষেত্রে জনবলের বিষয়টিকে আয়াতে, হাদীসে ও ফিকহে ইসলামীতে যেভাবে স্পষ্ট করে খুলে খুলে বলা হয়েছে, সামর্থ্যের অর্থবলের বিষয়টিকে সেভাবে বলা হয়নি। এ থেকে আমরা দু'টি বিষয় উদ্ধার করতে পারি-

এক. জিহাদের ক্ষেত্রে সামর্থ্যের মূল বিষয় হচ্ছে জনবল, অর্থবল মুখ্য কোন বিষয় নয়।

দুই. অর্থবলের এমন কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নেই যা অর্জিত হলে জিহাদ করবে, না হয় জিহাদ করবে না। বরং অর্থবলের মাপকাঠিতে বলা হয়েছে, প্রত্যেক মুজাহিদ তার সামর্থ্যের সবটুকু ব্যয় করে জিহাদে শরিক হবে।

এছাড়া আয়াত, হাদীস, সীরাত ও ইসলামের ইতিহাস থেকে যে কয়েকটি বিষয় খুবই স্পষ্ট হয়ে সামনে আসে সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে:

১. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলামানদের উপর জিহাদ ফরয করার ক্ষেত্রে যেমনিভাবে তাদের প্রাণ বিসর্জন দেয়ার জন্য আদেশ করেছেন, তেমনিভাবে তাদের মাল ও সম্পদও ব্যয় করার জন্য আদেশ করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤١) سورة التوبة

অনুবাদ: "তোমরা হালকা ও ভারি অবস্থায় বের হয়ে যাও এবং তোমাদের মাল-সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জান"। -সূরা তাওবা ০৯:৪১

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে এসেছে-

عن أنس رضي اللّهُ عنهُ أَنَّ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ: جاهدوا المشْركين بأموالكُمْ وأنفسكم وألسنتكمْ. رواهُ أحمد والنسائيُّ وصحّحهُ الحاكمُ، إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم

অনুবাদ: "আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর তোমাদের মাল-সম্পদ দিয়ে, তোমাদের প্রাণ দিয়ে এবং তোমাদের যবান দিয়ে"। মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ১২২৬৮

৩. কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ বলেন-

الحديث دليل على وجوب الجهاد بالنفس، وهو: بالخروج والمباشرة للكفار، وبالمال وهو: بذله لما يقوم به من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوه.

وهذا هو المفاد من عدة آيات في القرآن {جاهدوا بأموالكم وأنفسكم}. سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني، كتاب الجهاد

অনুবাদ: "হাদীস এ কথা প্রমাণ করে যে, জান দিয়ে জিহাদ করা ফরয। আর তা হচ্ছে জিহাদে বের হওয়া এবং কাফেরদের মুখোমুখী হওয়া। এমনিভাবে মাল-সম্পদ দিয়ে জিহাদ করা ফরয। আর তা হচ্ছে মাল-সম্পদ খরচ করা, যা জিহাদের অস্ত্র ইত্যাদির খরচে ব্যবহার করা হবে। কুরআনের একাধিক আয়াত যেমন جاهدوا بأموالكم وأنفسكم থেকে এ কথাই বের হয়ে আসে"। -সুবুলুস সালাম, কিতাবুল জিহাদ

৪. সীরাত থেকে পাওয়া যায়, মুসলমানদের যখন নিয়মতান্ত্রিক বাইতুল মাল ছিল না, তখন মুজাহিদগণ তাঁদের নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে জিহাদের ব্যয়ভার গ্রহণ করেছেন। এছাড়া মুসলমানদের উপর যখন জিহাদ ফরয হয় তখন তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য বাইতুল মালের কোন ব্যবস্থা ছিল না; বরং এর কোন অস্তিত্বও ছিল না।

এতদসত্ত্বেও তাঁদের উপর জিহাদ ফরয ছিল। যা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের ব্যক্তিগত সম্পদগুলো জিহাদের জন্য অর্থবল হিসাবে বিবেচিত। আর্থিক সামর্থ্য সাব্যস্ত হওয়ার জন্য সমৃদ্ধ বাইতুল মাল থাকা জরুরী নয়।

৫. কুরআন ও হাদীসের আলোকে ফিকহে হানাফীতে জিহাদের জন্য অর্থবল ও অর্থ খরচের বিষয়টিকে এভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে-

[تنبيه] من قدر على الجهاد بنفسه وماله لزمه ولا ينبغي له أخذ الجعل ، ومن عجز عن الخروج وله مال ينبغي أن يبعث غيره عنه بماله وعكسه إن أعطاه الإمام كفايته من بيت المال لا ينبغي له أن يأخذ من غيره جعلا ، وإذا قال القاعد للغازي : خذ هذا المال لتغزو به عني لا يجوز ؛ لأنه استئجار على الجهاد بخلاف قوله : فاغز به ومثله الحج وللغازي أن يترك بعض الجعل لنفقة عياله ؛ لأنه لا يتهيأ له الخروج إلا به. رد المحتار، كتاب الجهاد

অনুবাদ: "বিশেষভাবে উল্লেখ্য: যে ব্যক্তি নিজের জান মাল নিয়ে জিহাদ করতে সক্ষম তার জন্য নিজের জান মাল দিয়ে জিহাদ করা আবশ্যক হবে। তার জন্য পারিশ্রমিক নেয়া উচিত নয়। আর যে নিজে জিহাদে বের হতে সক্ষম নয়, কিন্তু তার মাল-সম্পদ আছে, তার জন্য উচিৎ, সে নিজের মাল-সম্পদ দিয়ে অপর ব্যক্তিকে জিহাদে পাঠাবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তিকে ইমাম বাইতুল মাল থেকে প্রয়োজন পরিমাণ খরচ দিয়েছে তার জন্য অন্য কারো থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয নেই। অক্ষম ব্যক্তি যখন যোদ্ধাকে বলবে, তুমি আমার পক্ষ থেকে যুদ্ধ করার জন্য এই মাল নাও, তাহলে তা জায়েয হবে না। কেননা এটা জিহাদের বিনিময়ে পারিশ্রমিক হয়ে যাবে। এরই বিপরীত যদি বলে, এই মাল নাও এবং তা দিয়ে যুদ্ধ কর। অনুরূপ মাসআলা হজ্জের ক্ষেত্রেও। আর যোদ্ধা তার খরচার কিছু অংশ পরিবারের খরচের জন্য রেখে যেতে পারবে। কেননা এটা ছাড়া সে জিহাদে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে পরবে না।" -রাদ্দুল মুহতার, কিতাবুল জিহাদ

ফিকহে ইসলামীর এ বক্তব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়টি হচ্ছে, জিহাদের অর্থবলের মূল মাপকাঠি হচ্ছে মুজাহিদের নিজস্ব সামর্থ্য। যার উপর জিহাদ ফরয তার উপর জিহাদের জন্য নিজের সম্পদ খরচ করাও ফরয। এমনকি শারিরিক ওযরের কারণে বা অন্য কোন শরয়ী ওযরের কারণে যে নিজে জিহাদে শরিক হতে পারবে না, সে তার নিজের মাল-সম্পদ দিয়ে অন্য কাউকে জিহাদে পাঠানো তার কর্তব্য।

সীরাত ও ফিকহের বক্তব্য থেকে এ কথাও স্পষ্ট যে, একজন মুজাহিদ তার পরিবারের জরুরী খরচের ব্যবস্থা করার পর বাকি সম্পদ থেকে জিহাদের জন্য জরুরী পরিমাণ খরচ করা তার দায়িত্ব। অর্থবলের জন্য সামষ্টিক কোন অর্থব্যবস্থা থাকা জরুরী নয়, বা জিহাদের জন্য তা শর্তের অন্তর্ভুক্ত নয়। মুসলমানদের বাইতুল মাল গঠিত হলে সেখানে থেকে ক্ষেত্রবিশেষে খরচ করা হবে, কিন্তু জিহাদের মূল খরচ বহন করবে খোদ মুজাহিদ।

তিন. সামর্থ্যের অস্ত্রবল

জিহাদের ক্ষেত্রে অস্ত্রবল একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় এবং একটি মৌলিক উপাদান। কুরআন সুন্নাহতে এ বিষয়ে আমরা যে নির্দেশনাগুলো পাই তা হচ্ছে যথাক্রমে:

১. অস্ত্রের উপাদান আল্লাহপ্রদত্ত একটি নিয়ামত।

২. অস্ত্র তৈরি মুসলমানদের উপর অর্পিত একটি ফরয দায়িত্ব।

৩. অস্ত্র তৈরি একটি ফযিলতপূর্ণ আমল।

৪. অস্ত্র তৈরি মুসলমানদের ব্যক্তিগত একটি আমল।

৫. অস্ত্র প্রশিক্ষণ মুসলমানদের ব্যক্তিগত একটি দায়িত্ব।

আয়াত ও হাদীসগুলোর উপর একটু ধারাবাহিক নযর বুলিয়ে নিন।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (٢٥)سورة الحديد

অনুবাদ: "আমি অবশ্যই রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ পাঠিয়েছি এবং আমি তাদের সাথে কিতাব ও ন্যায়দন্ড পাঠিয়েছি। যাতে করে মানুষ ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর তাদের জন্য আমি লোহা নাযিল করেছি, যার মাঝে বিপুল রণশক্তি ও মানুষের বহুবিদ উপকার রয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা প্রকাশ করতে চান, কে না দেখেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের সাহায্যে এগিয়ে আসে। আল্লাহ প্রচন্ড শক্তিশালী ও মহাপরাক্রমশালী।" -সূরা হাদীদ ৫৭:২৫

আয়াতের وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ অংশের তাফসীরে ইমাম ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ বলেন-

أي: وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه؛ ولهذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور المكية، وكلها جدال مع المشركين، وبيان وإيضاح للتوحيد، وتبيان ودلائل، فلما قامت الحجة على من خالف شرع الله الهجرة، وأمرهم بالقتال بالسيوف، وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده.

অনুবাদ: "অর্থাৎ দলিল প্রমাণের মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পরও যারা সত্যের বিরোধিতা করবে তাদের প্রতিরোধের জন্য আমি লোহাকে বানিয়েছি। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের পর মক্কায় তের বছর অবস্থন করেছেন, যখন তাঁর উপর মক্কী সূরাগুলো অবতীর্ণ হত, যেগুলোতে মুশরিকদের সঙ্গে যুক্তি তর্ক এবং তাওহীদকে স্পষ্ট করার দলিল প্রমাণের বিবরণ ছিল। এরপর যখন বিরোধীদের সামনে দলিল পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তখন আল্লাহ তাআলা হিজরতের বিধান দিয়েছেন, তাদেরকে তরবারী

দ্বারা যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন। যারা কুরআনের বিরোধিতা করেছে, কুরআনকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে এবং তার বিরোধিতা করেছে তাদের ঘাড়ে ও মাথায় আঘাত করতে আদেশ করেছেন।" -তাফসীরে ইবনে কাসীর

عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به والممد به وقال ارموا واركبوا ولأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق.

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

قال ابو عيسى وفي الباب عن كعب بن مرة و عمرو بن عبسة و عبد الله بن عمرو وهذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله

অনুবাদ: "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবু হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা একটি তীরের উসিলায় তিন জনকে জান্নাতে প্রবেশ করান। তার কারিগর যে তা বানিয়ে নেকের আশা করে, তীর নিক্ষেপকারী এবং যে তা এগিয়ে দেয়। তিনি আরো বলেন, তোমরা তীর নিক্ষেপ কর এবং বাহনে আরোহন কর। কেননা, তোমাদের তীর নিক্ষেপ করা আমার কাছে আরোহন করার চাইতে উত্তম। কোন মুসলমান যা দিয়ে খেলাধুলা করে তার সবই অসার, তবে ধনুক দিয়ে তীর মারা, তার ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং স্ত্রীর সঙ্গে খেলা করা ব্যতীত। কেননা, এগুলো হচ্ছে হক-দায়িত্ব।" -সুনানে

তিরমিযী, কিতাবুল জিহাদ, আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপের ফযীলত অধ্যায়

এ হাদীসে অস্ত্র তৈরি, অস্ত্রের প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র ব্যবহারের প্রতিটি পর্বে যার যা করার সামর্থ্য রয়েছে তা তার উপর অর্পিত দায়িত্ব এবং শরীয়তের পাওনা হক।

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أجرى المضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وبينهما ستة أميال وما لم يضمر من الخيل من ثنية الوداع إلى المسجد بني زريق وبينهما ميل وكنت فيمن أجرى فوثب بي فرسي جدارا .

قال أبو عيسى وفي الباب عن ابي هريرة و جابر و عائشة و أنس وهذا حديث صحيح غريب من حديث الثوري. سنن الترمذ، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق

অনুবাদ: “ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীর্ণশীর্ণ ঘোড়াকে ‘হাফয়া’ থেকে ‘সানিয়াতুল ওয়াদা’ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা দিয়েছেন, যার দূরত্ব হচ্ছে ছয় মাইল। আর যে ঘোড়া জীর্ণশীর্ণ পাতলা নয় সেগুলোকে ‘সানিয়াতুল ওয়াদা’ থেকে ‘মসজিদে বনি যুরাইক’ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা দিয়েছেন। যাদেরকে তিনি ঘোড়দৌড়ে পাঠিয়েছেন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। তখন আমার ঘোড়া আমাকে নিয়ে একটি দেয়াল টপকে পার হয়ে গেছে।” -সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল জিহাদ, রেহান ও প্রতিযোগিতা অধ্যায়

ঘোড় দৌড় এবং ঘোড়ার এ প্রতিযোগিতার পেছনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মেধা ও সময় ব্যয় করেছেন, কারণ তা জিহাদের উপাদান। জিহাদের অস্ত্রবল, যা অর্জন করা প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব।

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر .

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذ، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق

অনুবাদ: "আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নেযা, উট ও ঘোড়া ছাড়া আর কোন কিছুতে প্রতিযোগিতা নেই।" -সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল জিহাদ, রেহান ও প্রতিযোগিতা অধ্যায়

অস্ত্র ও যুদ্ধের উপাদানগুলোর প্রস্তুত ও ব্যবহার শেখা মুসলমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব। যে প্রতিযোগিতা শরীয়তে কাম্য কোন বিষয় নয়, সে প্রতিযোগিতাকে শুধু এ জন্যই বৈধতা দেয়া হয়েছে যেন প্রতিটি মুসলমান অস্ত্রের ব্যবহার শিখতে পারে এবং কুফরী শক্তির মোকাবেলা করার জন্য যেন নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলে।

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الخيل لثلاثة: هي لرجل أجر، وهي لرجل ستر وهي على رجل وزر. فأما الذي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله هي له أجر لا يغيب في بطونها شيء إلا كتب الله له أجرا وفي الحديث قصة .

قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو هذا. سنن الترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في فضل من ارتبط فرسا في سبيل الله

অনুবাদ: "আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

কেয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ লিখিত রয়েছে। ঘোড়া তিন ধরনের। এক ঘোড়া তার মালিকের জন্য সাওয়াবের উসিলা, এক ঘোড়া তার মালিকের জন্য পর্দাস্বরূপ, আরেক ঘোড়া তার মালিকের জন্য বোঝাস্বরূপ। এর মধ্যে যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য সাওয়াবের উসিলা, তা হচ্ছে ঐ ঘোড়া যাকে সে আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহারের জন্য পালে, তা তার জন্য সাওয়াবের উসিলা। তার পেটে যা কিছুই গায়েব হয়ে যায় তার বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য সাওয়াব লিখেন। হাদীসে একটি ঘটনা রয়েছে।" -সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল জিহাদ, আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়া বেঁধে রাখার ফযীলত অধ্যায়

এ সামরিক যান প্রতিটি মুসলমান তার নিজ দায়িত্বেই সংগ্রহ করবে এবং তার পরিচর্যা করবে।

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٦٠) سورة الأنفال

অনুবাদ: "তাদের (কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য) জন্য তোমরা যথাসাধ্য সাজ-সরঞ্জাম, শক্তি ও ঘোড়া প্রস্তুত রাখ এবং তা দিয়ে তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমনদের ভীতসন্ত্রস্ত করে দাও। এমনিভাবে তারা ব্যতীত আরো কিছু মানুষকে যাদেরকে তোমরা চেন না, কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদেরকে আদায় করে দেয়া হবে এবং তোমাদের উপর বিন্দুমাত্রও জুলুম করা হবে না।" -সূরা আনফাল ০৮:৬০

সহীহ মুসলিমের বর্ণনাটি আরো স্পষ্ট-

عن عقبة ابن عامر ضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله علي وسلم: من علم الرمى ثم تركه فليس منا أو قد عصى. صحيح مسلم، كتب الجهاد، باب فضل الرمى والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه

অনুবাদ: "উকবা ইবনে আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ দিয়েছে অতঃপর তা ছেড়ে দিয়েছে বা ভুলে গেছে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথবা বলেছেন, তাহলে সে অবাধ্যতা করল।" -সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, فضل الرمى والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه

কুরআন হাদীস এবং মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের বক্তব্য থেকে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, ব্যক্তির অস্ত্রবলই জিহাদের অস্ত্রবল হিসাবে বিবেচিত। আর ব্যক্তির আর্থিক সামর্থ্য তার অস্ত্রবল হিসাবে বিবেচিত হবে। সম্মিলতভাবে কোন অস্ত্রভান্ডার থাকলে সেখান থেকে মুজাহিদগণকে সহযোগিতা করা হবে। তবে না থাকলে ব্যক্তির সামর্থ্যের ভিত্তিতে জিহাদের ফরয বিধান আপন জায়গায় বহাল থাকবে। তবে বিশেষ মুহূর্তে কোন মুজাহিদ নিরস্ত্র হয়ে কোন সশস্ত্র শত্রুর সামনে পড়ে গেলে তার জন্য পালিয়ে আসার অনুমতি আছে। এটি একটি ভিন্ন বিষয়। জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য অস্ত্রের সামর্থ্য একটি ভিন্ন বিষয়।

চার. সামর্থ্যের কৌশলবল

সামর্থ্যের আলোচনায় কৌশলবল একটি ব্যাপক আলোচিত বিষয়। বিষয়টি আমাদের মনের মাঝে এভাবে জমে আছে যে, বিশ্বের মুসলমানদের অর্থ, শক্তি, ভূমি ও জনবল সবকিছুকে বিশ্ব কুফরীশক্তি এমন কৌশলে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে, যা থেকে বের হওয়া সম্ভব নয়। আমরা যেহেতু আমাদের অর্থ, জনবল, অস্ত্রবল ও ভূমির মাঝে সমন্বয় করতে পারছি না। আমাদের জনবলকে শত্রুপক্ষ বহুধা বিভক্ত করে রেখেছে, তাদের মাঝে এমন দেয়াল বানিয়ে রেখেছে যে দেয়াল টপকে আমাদের জনবলকে একিভূত করা সম্ভব নয়। আমাদের মুসলিম বিশ্বের অর্থগুলোকে তারা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে যে, তা আমরা আমাদের মত করে খরচ করতে পারি না। আমাদের অস্ত্রের উপর তাদের এমন নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, যা থেকে আমরা বের হতে পারছি না।

এ কথাগুলো আমরা আমাদের মনের মাঝেও জিইয়ে রেখেছি। বিভিন্ন আলোচনা প্রসঙ্গে বিজ্ঞের মতো কথাগুলো আমরা বলতেও থাকি।

এ ক্ষেত্রে সত্য কথা হচ্ছে, যে বিষয়গুলো আমাদের মুখে আসতে লজ্জা হওয়ার কথা ছিল, সেগুলো আমরা গর্বের সাথে বলে বেড়াই। প্রকৃতিগতভাবে কুফরী শক্তিকে কৌশলের মেধা বেশি দেয়া হয়নি। মুলমানদেরকে কৌশলের মেধাও দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কৌশল শেখানোও হয়েছে। শত হাজার বছর যাবত সে কৌশলের অনুশীলন হয়েছে। যে পর্বে এসে মুসলমান চলমান সে কৌশলটিকে ব্যবহার করা ভুলে গেছে এবং তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা ছেড়ে দেয়া হয়েছে, সে পর্ব থেকে মুসলমানদের অপরাধের পর্ব শুরু হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত সে কৌশলকে তারা আবার নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে না আসবে ততদিন পর্যন্ত তাদের অপরাধের মাত্রা বাড়তেই থাকবে। এটি হচ্ছে একটি কথা।

আরেকটি কথা হচ্ছে, মানব জাতির সূচনালগ্ন থেকে বাহ্যত শয়তানের কৌশলগুলোই বেশি শক্তিশালী ছিল। কিন্তু বাস্তবিকভাবে শয়তানের কৌশল কখনো শক্তিশালী ছিল না।

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (٧٦) سورة النساء

অনুবাদ: “যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে আর যারা কাফের তারা শয়তানের পথে লড়াই করে সুতরাং তোমরা শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাক, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল”। সূরা নিসা- ০৪:৭৬

কুরআনের এ ঘোষণার বাস্তবতাকে মুসলমান স্বীকার করতেই হবে। কুফরী শক্তির কৌশলকে একটি ওযর হিসাবে দাঁড় করানোর অর্থই হচ্ছে কুরআনের এ আয়াতকে বিশ্বাস না করা। আমরা আমাদের অবহেলা ও

হেয়ালিপনা বশত এমন কিছু বলে ফেলি যা আমাদের ঈমানকে ঝুঁকিতে ফেলে দেয়। আল্লাহ হেফাযত করুন।

সামর্থ্যের চার দিক ও আমাদের বর্তমান অবস্থা

সামর্থ্যের যে দিকগুলো নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোর সঙ্গে আমাদের বর্তমান অবস্থাকে এবার একটু মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। সামর্থ্যের চারটি দিক আবার একটু স্মরণ করুন। জনবল, অর্থবল, অস্ত্রবল ও কৌশলবল। বর্তমান বিশ্বের মুসলিম জনসংখ্যা, মুসলিম বিশ্বের সশস্ত্রবাহিনী, তেল-সোনার খনির অধিকারী অনেকগুলো মুসলিম দেশের উপস্থিতি, পারমাণবিক অস্ত্রসহ বিশাল অস্ত্রভান্ডারের অধিকারী অনেকগুলো মুসলিম দেশের উপস্থিতি এবং এর সাথে সাথে কুরআন-হাদীস ও ফিকহে ইসলামীতে বিবৃত বিশ্বব্যাপী জিহাদ পরিচালনার কৌশলগুলো চর্চা এখনো আমাদের পঠিত কিতাবাদিতে সচল রয়েছে, যা আমাদের চোখের আড়াল হওয়া সম্ভব নয়, এমতাবস্থায় আমরা সামর্থ্যের কোন দিকের ব্যাপারে বলতে পারি যে, আমাদের সামর্থ্য নেই?

আমার উত্থাপিত এ প্রশ্নটির অনেকগুলো সহজ উত্তর রয়েছে, যে উত্তরগুলো আমরা বিগত অনেক যুগ যাবত চর্বণ করে চলেছি এবং নিজেদেরকে দায়িত্বমুক্ত মনে করার জন্য যথেষ্ট মনে করে আসছি। আমি এখন সে সহজ উত্তরগুলো উল্লেখ করব এবং তার উপর কিছু সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন করে সে বিষয়ে শরীয়তের সিদ্ধান্তগুলো জানার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

সহজ উত্তর-১: বিশ্বে দেড়শত কোটি মুসলমান থাকলেও তাদের পরস্পরে ঐক্য নেই। এ সংখ্যা দিয়ে মুজাহিদের সংখ্যা বিচার করলে ভুল হবে। এ ধরনের মুসলমানদের সংখ্যাকে সামনে রেখে জনবলের সামর্থ্য আছে বলা যায় না। অতএব জনবলের বিবেচনায় সামর্থ্য নেই, এটাই বাস্তবতা।

শরীয়তের সিদ্ধান্ত: শরীয়তের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক মুসলমানের উপস্থিতি থাকলে তাদের উপর জিহাদ করা ফরয। জনবলের সামর্থ্য আছে, এটাই বলা হবে। মুসলমানরা নিজেদের পরস্পরের ঐক্য বিনষ্ট করে জিহাদের ফরয দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবে না। এটি কোন ওযর নয়। এটা হচ্ছে প্রথম কথা।

এ বিষয়ে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, 'ঐক্য নেই' কথাটি সঠিক নয়। কারণ আমাদের দেশে এবং চলমান এ পৃথিবীতে বিভিন্ন শিরোনামে হাজার হাজার ও লক্ষ লক্ষ মুসলমানের জমায়েত আছে। একই ব্যক্তির অনুসরণে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের ঐক্য আছে। একই ব্যক্তির আদেশ-নিষেধ মানার মতো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে। কমপক্ষে বার হাজার মুসলমানের ঐক্যের উদাহরণ এ দেশে ও এ পৃথিবীতে এক দু'টি নয়। এর উদাহরণও হাজার হাজার রয়েছে।

এমন অসংখ্য মুহতামিম রয়েছেন, যাঁদের হাজার হাজার শাগরেদ প্রতিদিন তাঁদের শত শত আদেশ নিষেধ মেনে চলেছে। যেসব শাগরেদ তাদের মুহতামিম ও উস্তাযের আদেশ অমান্য করাকে বৈধ মনে করে না; বরং সেসকল মুহতামিম ও উস্তাযগণের আদেশ-নিষেধ মেনে চলাকে নিজেদের জন্য অপরিহার্য্য মনে করে থাকে। তারা তাদের মুহতামিম ও উস্তাযের যে কোন হুকুমকে ঐক্যবদ্ধভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য সব সময় প্রস্তুত।

এমন অসংখ্য পীর রয়েছেন যাঁদের লক্ষ লক্ষ অনুসারী প্রতিদিন তাদের প্রতিটি আদেশ নিষেধকে মেনে চলেছে। তারা তাদের পীরের আদেশ-নিষেধের বিরোধিতা করাকে বৈধ মনে করে না। জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে তারা তাদের পীরের অনুসরণ করাকে জরুরী মনে করে থাকে। তারা পীরের যে কোন হুকুমকে ঐক্যবদ্ধভাবে বাস্তবায়ন করতে সব সময় প্রস্তুত।

এমন অসংখ্য মুসলিম নেতা রয়েছেন, যাদের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কর্মী-সমর্থকরা তাদের যে কোন আদেশ-নিষেধ শোনার জন্য এবং তা বাস্তবায়ন করার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকে। তারা নিজেদের জান-

প্রাণ দিয়ে হলেও নেতার হুকুমকে বাস্তবায়ন করে ছাড়বে, এমন মনোভাব তারা সব সময়ই ব্যক্ত করতে থাকে।

এমন অসংখ্য সমাদৃত ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁদের যে কোন নির্দেশনা শোনার জন্য, গ্রহণ করার জন্য ও বাস্তবায়ন করার জন্য হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সাধারণ মুসলমান সব সময় মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে। যে কোন আমল করা বা না করা সম্পর্কে প্রশ্ন আসলে তারা সেসকল সমাদৃত ব্যক্তিবর্গের উদ্ধৃতি দিয়ে বলে থাকে, অমুক করতে বলেছেন তাই আমরা করেছি, অথবা অমুক করতে বলেননি তাই করিনি।

এমন অসংখ্য মুফতী মুহাদ্দিস রয়েছেন যাদের ফাতওয়া ও শরয়ী সিদ্ধান্তকে সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত হিসাবে বিশ্বাস করার মত লক্ষ লক্ষ ওলামা ও তালাবা আছে। তাদের সিদ্ধান্তকে শরীয়তের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে মেনে নেয়ার মত লক্ষ লক্ষ সাধারণ মুসলমান আছে। যাদের ইলমী তাহকীকের উপর দেশের ও বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানের আস্থা ও বিশ্বাস আছে। অধিকাংশ মুসলমান যাঁদেরকে ইলমী তাহকীকের বিষয়ে আমানতদার মনে করে।

এমন অসংখ্য সমাজপতি রয়েছেন, যাঁদের অধীনে সমাজের হাজার হাজার মুসলমান পরিচালিত হয়ে থাকে। যাঁদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে তারা বাধ্য। যাঁদেরকে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজপতি হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। যাঁদের অবাধ্যতাকে সমাজের মুসলমানরা বিপজ্জনক মনে করে থাকে।

এভাবে এ দেশে ও সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের এমন অসংখ্য ইউনিট ও জমায়েত রয়েছে, বিভিন্ন বিষয় ও প্রেক্ষাপটে যাদের সম্মিলত অবস্থান ও ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ এ কথা প্রমাণ করে যে, জিহাদের জন্য যে পরিমাণ লোকবলের ঐক্যবদ্ধ উপস্থিতি জরুরী সে পরিমাণ লোকবলের ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের হাজার হাজার উদাহরণ রয়েছে।

জিহাদের জন্য লোকবলের সামর্থ্যের যে কথা রয়েছে, তা এর চাইতে বেশি কিছু নয়। এর চাইতে আরো অস্বাভাবিক কোন লোক সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং মুসলমানদের এ ধরনের যে কোন একটি

ইউনিট বা একটি জামাত জিহাদের ফরয দায়িত্ব আদায়ের সামর্থ্য রাখে এবং জনবল ও সংখ্যা বিষয়ক কোন ওযর তাদের নেই।

এ ইউনিট ও জামাতগুলোর বিষয়ে যদি কেউ বলতে চান যে, এগুলোর আভ্যন্তরীণ ঐক্য এতটা মজবুত নয় যে, এদের দ্বারা একটি যুদ্ধ পরিচালনা করা যায়। তাহলে আমরা প্রথমত বলব এ জামাতগুলোর অনুসারী ও অনুসৃত কেউ এমন দাবি করেন না; বরং তাদের পরস্পর ঐক্য অনেক বেশি মজবুত ও সুদৃঢ় বলেই তারা দাবি করে থাকে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, জিহাদের দায়িত্বটি ফরয হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এরচাইতে আর বেশি কিছু শরীয়ত দাবি করে না। এরপরও যদি কেউ এগুলোকে ওযর হিসাবে উপস্থাপন করতে চায় তাহলে তারা এ আয়াত থেকে নসীহত গ্রহণ করতে পারে-

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٤) سورة التوبة

অনুবাদ: "তারা তোমাদের কাছে ওযর পেশ করবে যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে; (হে নবী) তুমি বলে দাও, তোমরা ওযর পেশ করো না, আমরা কখনো তোমাদেরকে সত্যবাদী বলে মনে করব না, আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের (জিহাদে না যাওয়ার) বৃত্তান্ত জানিয়ে দিয়েছেন, আর ভবিষ্যতেও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করবেন, অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে এমন সত্তার কাছে যিনি অদৃশ্য এবং প্রকাশ্য সকল বিষয়েই অবগত আছেন, অনন্তর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা কিছু তোমরা করছিলে।" -সূরা তাওবা- ০৯:৯৪

সহজ উত্তর-২: নামের মুসলমানের লক্ষ কোটি সংখ্যা দিয়ে কী ফায়দা? মুসলমানদের মজবুত ঈমান নেই। দ্বীনের প্রতি তাদের দরদ নেই। অত্মত্যাগের মানসিকতা নেই। অতএব এমন নামের মুসলমানদের

সংখ্যা গণনা করে জিহাদের মত একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে হাত দেয়া যায় না।

শরীয়তের সিদ্ধান্ত: 'নামের মুসলমান'দের উপরই শরীয়তের প্রতিটি বিধান অপরিহার্য্য করা হয়েছে। যে বিধানগুলো পালন করতে করতে তারা 'কামের মুসলমান' (সত্যিকার মুসলমান) হয়ে যাবে। নামের মুসলমান যদি মুসলমান না হয়ে থাকে তাহলে তারা কাফের, তাদের সঙ্গে মুসলমানসুলভ কোন আচরণ করার সুযোগ নেই। আর যদি নামের মুসলমানরা মুসলমান হয়ে থাকে তাহলে তাদের উপর শরীয়তের সকল বিধান বর্তাবে এবং তাদেরকে নিয়ে দ্বীনের ইজতেমায়ী-সম্মিলিত সবগুলো কাজ করতে হবে।

এক সময় মুসলমানদের মজবুত ঈমান থাকবে না, তাদের আত্মত্যাগের মানসিকতা থাকবে না, দ্বীনের প্রতি কাংখিত পরিমাণ দরদ থাকবে না -এসকল হালাতকে সামনে রেখেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যোদ্ধাদের সংখ্যার বিষয়ে বিধানে শিথিলতা দান করেছেন। দশগুণ কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ফরয বিধান ছিল। পরে দ্বিগুণ কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার বিধান দেয়া হয়েছে। যা কেয়ামত পর্যন্ত সকল স্তরের সকল পর্যায়ের মুসলমানদের বেলায় প্রযোজ্য।

নামের মুসলমানদের ব্যাপারে তাদের নিজেদেরকেও এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তারা কি মুসলমান? না কাফের? তাদের ব্যাপারে আমাদেরকেও সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তারা কি মুসলমান? না কাফের?

তারা যদি মুসলমান হয়ে থাকে তাহলে তাদের উপর আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্বগুলো তাদেরকে অবশ্যই বুঝে নিতে হবে এবং আমাদেরকেও তাদের কাছ থেকে ওই দায়িত্বগুলো আদায় করে নিতে হবে। আর যদি কাফের হয়ে থাকে তাহলে তাদের বিষয়ে আল্লাহ আমাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা আমাদেরকে অবশ্যই স্মরণে আনতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা হলে এ আয়াতের মর্ম নিয়ে ভাবতে হবে-

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (١٤) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٥)سورة البقرة

অনুবাদ: "এবং যখন তারা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয় তখন তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা নিজেদের দলপতি ও দুষ্ট নেতাদের সাথে নির্জনে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি, আমরা তো শুধু ঠাট্টা- বিদ্রুপ করে থাকি। আল্লাহ তাদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের অবাধ্যতার মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে ফিরার জন্য ঢিল দেন।" -সূরা বাকারা- ০২:১৪-১৫

সহজ উত্তর-৩: যারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত তাদের হাতে টাকা নেই। যাদের হাতে টাকা আছে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নেই। যারা টাকা দিতে প্রস্তুত তারা যোদ্ধাদের হাতে টাকা পৌঁছাতে সক্ষম নয়। অতএব সব কিছু থাকা অবস্থায়ও সামর্থ্য আছে বলা যাবে না।

শরীয়তের সিদ্ধান্ত: এ বিষয়ে প্রথম কথা হচ্ছে, যাদের হাতে টাকা নেই তাদের কর্তব্য, যুদ্ধের জন্য টাকা জোগাড় করা এবং যে টাকা ওয়ালারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নেই তাদের কর্তব্য, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া। আর যারা জায়গা মতো টাকা পৌঁছাতে পারছে না তাদের কর্তব্য, জায়গা মতো টাকা পৌঁছানের রাস্তা খুঁজে বের করা।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (٤٦) سورة التوبة

অনুবাদ: "আর যদি তারা (যুদ্ধে) যাত্রা করার ইচ্ছা করত, তবে তার জন্য কিছু আসবাবপত্র তো প্রস্তুত করতো; কিন্তু আল্লাহ তাদের অভিযাত্রা অপছন্দ করেছেন, এ জন্য তাদেরকে পিছনে ফেলে রাখলেন,

তাদেরকে বলে দেয়া হল, তোমরাও এখানেই অক্ষম লোকদের সাথে বসে থাকো।" -সূরা তাওবা ০৯:৪৬

এ বিষয়ে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, একটি বাহন ও একটি অস্ত্র সংগ্রহ করার মত সামর্থ্যবান মুসলামানের সংখ্যা এখন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি। আমরা ইতিমধ্যে ঐক্যবদ্ধ যেসকল জামাতের উদাহরণ উল্লেখ করে এসেছি এমন জামাতের অন্তর্ভুক্ত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সদস্য এমন আছে যারা কমপক্ষে একটি বাহন ও একটি অস্ত্র সংগ্রহ করার মত সামর্থ্য রাখে। তারা এমন অনুসৃতের অনুসারী যে অনুসৃত বলার সাথে সাথে অনুসারীরা লক্ষ কোটি টাকা খরচ করতে কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করে না।

এ বিষয়ে তৃতীয় কথা হচ্ছে, বিত্তবানদের সামনে এখনো মুজাহিদদের কাছে টাকা পৌঁছানোর অসংখ্য পথ খোলা আছে। পৌঁছানোর চেষ্টা করার আগেই সম্ভাব্য বাধা ও প্রতিবন্ধকতার চিন্তা করে জিহাদের ফরয দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করার কোন সুযোগ নেই। এক পথে সম্ভব না হলে অন্য পথে যেতে হবে। সে পথে বাধা এলে তৃতীয় কোনো পথে যেতে হবে। অজুহাত খোঁজার কোন সুযোগ নেই। একজন মরণাপন্ন মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসার জন্য আমরা যত জায়গায় যতভাবে ধর্ণা দেই, একটি ফরয দায়িত্ব আদায়ের জন্যও তত জায়গায় ততভাবে ধর্ণা দিতে হবে।

এ বিষয়ে চতুর্থ কথা হচ্ছে, আমরা এখন যেসব বাধা ও প্রতিবন্ধকতার কথা বলছি, এসব বাধা ও প্রতিবন্ধকতার ইতিহাসও অনেক দীর্ঘ। মুসলমানদের পরস্পরের সহযোগিতার পথে শয়তানের বাধা দেয়া অনেক পুরাতন ইতিহাস। কিন্তু পরস্পরের সহযোগিতা কখনো বন্ধ হয়নি এবং পরস্পরের আদান প্রদানও বন্ধ হয়নি। প্রত্যেক যুগেই বাধা ও প্রতিবন্ধকতা ছিল, পাশাপাশি অনুপাতিক হারে সেসব বাধা ও প্রতিবন্ধকতার প্রতিকারও ছিল। এখনো সেসব বাধা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকারও আছে।

অতএব অর্থবলের অনুপস্থিতির ওযরে জিহাদের ফরয দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই।

সহজ উত্তর-৪: পারমাণবিক অস্ত্র থেকে শুরু করে ছোট বড় যত অস্ত্রের কথা বলা হচ্ছে, সেগুলো রাষ্ট্রপরিচালকদের কাছে রয়েছে। সরকারের কাছে রয়েছে। সেগুলো মুসলমানদের হাতে নেই, মুজাহিদদের হাতে নেই, সাধারণ মুসলমানদের হাতে নেই। অতএব মুসলমানদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্র আছে বলে দাবি করার কোন সুযোগ নেই। এগুলো বরং শত্রুর হাতে রয়ে গেছে।

শরীয়তের সিদ্ধান্ত: এ বিষয়ে প্রথম কথা হচ্ছে, জিহাদ ফরয হওয়া ও সামর্থ্য বিষয়ে যেসব আলোচনা করা হচ্ছে সেসব আলোচনার সম্বোধিত ব্যক্তি হিসাবে রাষ্ট্রপরিচালকবৃন্দ ও সরকারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রাষ্ট্রপরিচালক ও সরকারের সঙ্গে সরাসরি জড়িত যেসব হাজার হাজার মানুষ রয়েছে তাদের পক্ষে এ ওযর উপস্থাপন করার কোন সুযোগ নেই যে, অস্ত্রবল সরকারের হাতে। কারণ তারাই সরকার। তারাই রাষ্ট্রপরিচালক। সকল অস্ত্রের পরিচালনা তাদেরই হাতে।

এ বিষয়ে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এ ওযর যদি সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে উত্থাপিত হয় তাহলে দেখার বিষয় হচ্ছে, যে সরকার জিহাদ ফরয হওয়ার পরও জিহাদ করার অনুমতি দেয় না, সে সরকার কাদের সরকার? সাধারণ মুসলমান সে সরকারের সহযোগিতা করবে? না কি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে? না কি নীরব থেকে মনে করতে থাকবে, সরকার যা করতে বলবে তাই করতে হবে, এর বাইরে আর কিছু করা যাবে না।

এখানে কথাটি একটু খুলে বলা দরকার।

জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায়, তখন তা রাষ্ট্রপরিচালকদের উপরও ফরয হয় এবং সাধারণ মুসলিম জনগণের উপরও ফরয হয়ে যায়। রাষ্ট্রপরিচালক সে যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করা ফরয; কারণ তার কাছে যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্রবল রয়েছে। অতএব রাষ্ট্রপরিচালক যদি নিজে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে সে যুদ্ধে শরিক করে নেয়

তাহলে এ ফরয দায়িত্ব খুব সহজেই আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর যদি রাষ্ট্রপরিচালক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধা দেয় এবং মুসলমানদেরকে অস্ত্রবল দিয়ে সহযোগিতা না করে, তাহলে তার বাধা ও অসহযোগিতাকে উপেক্ষা করে জিহাদে যাওয়া মুসলমানদের উপর ফরয।

এ পর্যায়ে এসে রাষ্ট্রপক্ষের কয়েকটি অবস্থা হতে পারে-

এক. রাষ্ট্রপক্ষ ও দেশের পরিচালক পক্ষ ধর্মের শিরোনামে ইসলামের পক্ষ নিয়ে কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে ফরয মনে করে না; এ যুদ্ধকে তারা অবৈধ মনে করে। এ জিহাদকে তারা সাম্প্রদায়িক লড়াই হিসাবে আখ্যায়িত করে। যারা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায় তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য সব ধরণের চেষ্টা প্রচেষ্টা করে। ক্ষেত্রবিশেষে তারা কাফেরদের পক্ষ নিয়ে মুসলিম মুজাহিদদেরকে প্রতিহত করা জরুরী মনে করে।

এর উদাহরণ হচ্ছে বিশ্বের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ দেশগুলোর সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা।

দুই. রাষ্ট্রপক্ষ ও দেশের পরিচালকপক্ষ ধর্মের শিরোনামে ইসলামের পক্ষ নিয়ে কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে ফরয মনে করে। এমন একটি বিধান ইসলামী শরীয়তে আছে বলে তারা স্বীকার করে। তবে বর্তমানে সে জিহাদের অস্তিত্ব আছে বলে তারা মনে করে না। তারা মনে করে, বিশ্বব্যাপী মুসলমান ও কাফেরদের পরস্পরে সন্ধি হয়ে যাওয়ার কারণে ধর্মভিত্তিক জিহাদের আর কোন প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে তারা এ কথাও মনে করে যে, শত্রুপক্ষের সঙ্গে লড়াই না করে তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে দ্বীনের কাজ করা যতটা সহজ তাদেরকে অসন্তুষ্ট করে ততটা সহজ নয়।

এর উদাহরণ হচ্ছে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজতান্ত্রিক কিছু দেশ।

তিন. রাষ্ট্রপক্ষ ও দেশের পরিচালক পক্ষ ধর্মের শিরোনামে ইসলামের পক্ষ নিয়ে কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে ফরয মনে করে।

এ ফরয দায়িত্ব তারা তাদের সাধ্যমতো আদায় করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এ দায়িত্ব আদায়ের বিষয়ে তাদের প্রস্তুতি আছে। প্রস্তুতির ধারাবাহিকতা চালু আছে। আন্তর্জাতিক শত্রুপক্ষ তাদের শত্রুতার অনুশীলনের জন্য বিশ্বব্যাপী কোথায় কী করছে? কী কী পদক্ষেপ নিচ্ছে? সেসব তথ্য সংগ্রহের পেছনে তাদের জাগ্রত দৃষ্টি রয়েছে এবং তার প্রতিকারের সাধ্যমাফিক আয়োজনও তারা করে চলেছে। বিশ্বের ইসলামী শক্তিগুলোকে সর্বোচ্চ কাজে লাগানোর জন্য তাদের ধারাবাহিক ফিকর ও মেহনত চলমান রয়েছে।

এর উদাহরণ হচ্ছে, মানবরচিত আইনের বিরুদ্ধে জিহাদে রত মুজাহিদদের ভূখন্ডগুলো এবং মুজাহিদদের কাফেলাগুলো।

রাষ্ট্রপক্ষ ও মুসলমান

যে প্রসঙ্গটি নিয়ে আমরা এ বিশ্লেষণে ঢুকেছি তা হচ্ছে, জিহাদ ফরয হওয়ার প্রশ্নে অস্ত্রবলের বিষয়টি বার বার আমাদের সামনে আসে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর কাছে যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্রের মজুদ রয়েছে। এর জবাবে বলা হয়েছে, এসব অস্ত্র রাষ্ট্রপ্রধানদের হাতে আছে, সাধারণ মুসলমানদের হাতে নেই। এ পর্যায়ে এসে আমরা বলতে চাই, মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয হওয়ার পর যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধান অস্ত্র সরবরাহ না করে এবং অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা না করে, তাহলে এ রাষ্ট্রপ্রধান কে? এবং তখন মুসলমানদের করণীয় কী? এ বিষয়গুলো একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার। আর সে জন্য বর্তমান পৃথিবীর চলমান অবস্থা অনুযায়ী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর প্রধানদেরকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

বলাবাহুল্য, এ তিন প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকারটি হচ্ছে মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধান, যারা জোরপূর্বক অন্যায়ভাবে মুসলমানদের উপর শাসন করে চলেছে। যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, তাদের সঙ্গে শত্রুতার প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়া, তাদের থেকে নিজেদের বারাআতের ঘোষণা দেয়া

মুসলমানদের উপর ফরয। তাদের আনুগত্য, তাদের আইন মানা বা তাদের কোন প্রকার স্বার্থ রক্ষা করার পেছনে সময় ও মেধা ব্যয় করার কোন বৈধতা নেই।

দ্বিতীয় প্রকারের রাষ্ট্রপ্রধানরা হচ্ছে, যথাক্রমে মুনাফিক ও মুলহিদ। যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মত শক্তি সামর্থ অর্জনের আগ পর্যন্ত মুসলমানরা নিজেদের মত করে জিহাদের প্রস্তুতি নেবে এবং জিহাদের পথে অগ্রসর হতে থাকবে এবং এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানদের আনুগত্য করার কোন সুযোগ নেই।

তৃতীয় প্রকারের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছেন মুলত শরয়ী পরিভাষায় আমীর বা আমীরুল মুমিনীন বা খলিফাতুল মুসলিমীন। এমন রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য সর্বক্ষেত্রে জরুরী। এমতাবস্থায় যদি জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়, কিন্তু এরপরও কোন কারণবশত যদি এমন রাষ্ট্রপ্রধান জিহাদের অনুমতি না দেন, তাহলে আমীরের আদেশ ও নিষেধকে উপেক্ষা করে জিহাদে শরিক হওয়া জায়েয আছে। জিহাদের এ ফরযে আইন আদায়ের মত শক্তি সামর্থ্য না থাকলে শক্তি সামর্থ্য অর্জন করা তাদের দায়িত্ব।

সুনির্ধারিত সিদ্ধান্ত লাগবে

এখানে প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো হবে, আমরা যখন এ কথা বলছি যে, আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানরা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। তারা কোন অবস্থায়ই অস্ত্র দিয়ে মুজাহিদদেরকে সাহায্য করবে না; বরং তাদের বিরোধীতা করবে। তখন আমরা এসকল রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে ঐ আচরণ করছি না, শরিয়তের পক্ষ থেকে তাদের সঙ্গে যে আচরণ করার কথা রয়েছে।

এখানে আমাদের মুসলিম কর্ণধারদেরকে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে-

হয়ত তাঁদেরকে বলতে হবে, এসকল রাষ্ট্রপ্রধান আমাদের তথা ইসলাম ও মুসলমানদের বন্ধু। অতএব তাদের কাছে অস্ত্রের যে সামর্থ্য রয়েছে তা আমাদেরই সামর্থ্য। তাই সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সামর্থ্য নেই বলে এ ফরয দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

অথবা বলতে হবে, এসকল রাষ্ট্রপ্রধান আমাদের তথা ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু। অতএব তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ, তাদের সঙ্গে শত্রুতার ঘোষণা এবং তাদের আনুগত্য থেকে নিজেদেরকে মুক্ত হওয়ার ঘোষণা দিতে হবে। যাতে মুসলিম উম্মাহ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে বুঝে নিতে পারে। এসব ক্ষেত্রে অস্পষ্টতাকে জিইয়ে রাখার কোন সুযোগ নেই।

হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ বিদ্রোহের জন্য, জিহাদের জন্য সামর্থ্য থাকার শর্ত দিয়েছেন। এ শর্তের পক্ষে ব্যাপক আলোচনা পর্যালোচনা হয়েছে। আলোচনা পর্যালোচনা করতে গিয়ে সামর্থ্য আছে কি না? তা তলিয়ে দেখা হয়নি। আর বাহ্যত সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা কেন সামর্থ্য হিসাবে বিবেচিত হয়নি? তাও দেখা হয়নি। এমনিভাবে সামর্থ্যগুলো যেখানে যেখানে কুক্ষিগত হয়ে আছে, যাদের হাতে নিয়ন্ত্রিত হয়ে আছে, তাদের সাথে মুসলমানদের আচরণ কি হবে? তাও দেখা হয়নি।

সহজ উত্তর-৫: মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানদের আয়ত্তাধীন সামর্থ্যগুলোকে বিশ্বকুফরী শক্তি কৌশলে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছে। যার দরুন সাধারণ মুসলমানতো প্রশ্নই আসে না, খোদ রাষ্ট্রপ্রধানরাও সে সকল সামর্থ্য নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করতে সক্ষম নয়। অতএব এসব সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে জিহাদ করা যায় না, এ সামর্থ্যকে সামর্থ্য বলা যায় না।

শরীয়তের সিদ্ধান্ত: এ কথাটি কিছুটা মামার বাড়ির আবদারের মত কথা। শরীয়তের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, মুসলমানদের হাতে একটি ভূখন্ড, একটি বিশাল জনগোষ্ঠী, অর্থের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত অস্ত্রের মজুদ থাকার পর তারা সারা বিশ্বের কুফরী শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে।

শত্রুপক্ষের শক্তিশালী কৌশল কখনো কোন প্রকার ওযর হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। কারণ কুফরী শক্তির তুলনায় ইসলামী শক্তির কৌশল প্রত্যেক যুগেই কয়েক ধাপ এগিয়ে ছিলি এবং এখনো এগিয়ে আছে। ধাপগুলো যথাক্রমে:

ক. ইসলামী শক্তির হাতে দেড় হাজার বছরের ধারাবাহিক বিজয়ের ইতিহাস আছে, যা কুফরী শক্তির হাতে নেই। যে ইতিহাসে সফলতার সাথে বিশ্ব পরিচালনার অভিজ্ঞতা আছে, যা শত্রুর হাতে নেই।

খ. ইসলামী শক্তির হাতে তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দেয়া কৌশল আছে, যা শত্রুর হাতে নেই।

গ. ইসলামী শক্তির হাতে তাদের রাসূল সাইয়েদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে-কলমে দেখিয়ে দেয়া কৌশলের সচিত্র রূপ আছে, যা শত্রুর হাতে নেই।

ঘ. ইসলামী শক্তির হাতে রাসূলে আরাবীর দেখিয়ে দেয়া কৌশলের উপর যে দীর্ঘ অনুশীলন হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, যা শত্রুর হাতে নেই।

সর্বোপরি মুসলিম জাতি ও ইসলামের কর্ণধারদের মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এ বাণী চিরসত্য, সর্বকালের জন্য সত্য, সকল প্রজন্মের ক্ষেত্রে সত্য-

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (٧٦) سورة النساء

অনুবাদ: "যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং যারা অবিশ্বাসী হয়েছে তারা শয়তানের পথে যুদ্ধ করে; অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধুদের সাথে যুদ্ধ কর; নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল দুর্বল।" -সূরা নিসা- ০৪:৭৬

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا (١٦) فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (١٧) سورة الطارق

অনুবাদ: "নিশ্চয় তারা (কাফেররা) ভীষণ এক ষড়যন্ত্র করেছে। আর আমিও একটি কৌশল করছি। অতএব কাফেরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে অবকাশ দাও কিছুকালের জন্য।" -সূরা ত্বারেক- ৮৬: ১৫-১৭

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١٠٤) سورة النساء

অনুবাদ: "এবং সে সম্প্রদায়ের অনুসরণে শৈথিল্য করো না। যদি তোমরা কষ্ট পেয়ে থাক তবে তারাও তোমাদের অনুরূপ কষ্টভোগ করে এবং তৎসহ আল্লাহ হতে তোমাদের যে আশা (জান্নাতের) আছে, তাদের সে আশা নেই এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।" -সূরা নিসা- ০৪: ১০৪

পাঁচ. সামর্থ্য না থাকলে করণীয় কি?

হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর উদ্ধৃতি দিয়ে এ বিষয়ের খুব চর্চা হয়েছে যে, সামর্থ্য না থাকলে জিহাদ করা যাবে না। আর এ চর্চা পর্যন্তই আলোচনার ইতি টানা হয়েছে। এরপর আলোচনা আর সামনে বাড়েনি যে, জিহাদ করার মত সামর্থ্য না থাকলে কি করতে হবে? জিহাদ করার মত সামর্থ্য না থাকা মুসলমানদের জন্য কোন ফযীলতের বিষয়? না কি এটি একটি অপরাধ? জিহাদ করার মত সামর্থ্য না থাকলে আল্লাহর দুশমনদের সঙ্গে সম্প্রীতিমূলক সহাবস্থান করবে? না কি শত্রুতার প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে হিজরত করতে হবে? আল্লাহর দুশমনদের সঙ্গে জিহাদ করার সামর্থ্য না থাকলে এবং শত্রুতার প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে না পারলে, তাদের সঙ্গে সম্প্রীতি গড়ে তুলবে? না কি বন্ধুত্বের প্রকাশ্য ঘোষণা দেবে? তা তলিয়ে দেখা হয়নি।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে সংক্ষেপে দু'একটি কথা বলেই এ আলোচনা শেষ করব ইনশাআল্লাহ।

শরীয়তের যে বিধানগুলো মুহকাম, অর্থাৎ যে বিধানগুলো মানসূখ-রহিত হয়ে যায়নি; বরং কেয়ামত পর্যন্ত যে বিধানগুলোর উপর আমল চলতে থাকবে, যে বিধানগুলো ফরযে আইন বা ফরযে কেফায়া এবং যে বিধানগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্র পৃথিবী থেকে কখনো শেষ হয়ে যাবে না, এমনিভাবে যে বিধানগুলো বাস্তবায়নের উপর শরীয়তের আরো অসংখ্য বিধান নির্ভরশীল, অর্থাৎ যে বিধানের উপর আমল না হলে আরো অসংখ্য বিধানের উপর আমল করা যায় না -কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ তথা আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র জিহাদ সেসব বিধানের অন্যতম।

এসকল বিধানের ক্ষেত্রে এমন সম্ভব নয় যে, যুগের পর যুগ পার হয়ে যাবে, শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে যাবে, কিন্তু একেক সময় একেক কারণে আমলগুলো বাস্তবায়ন করা যাবে না। এমনটি হতে পারে না।

ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাস বলে, বদর যুদ্ধের তিনশত তের থেকে শুরু করে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অর্ধ পৃথিবী শাসন এবং খেলাফতে বনু উমাইয়া, খেলাফতে আব্বাসী, উসমানী খেলাফতের বিশ্বব্যাপী শাসন পর্যন্ত কোন পর্বে কখনো কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ তথা আল্লাহর পথে সশস্ত্র জিহাদের বিধান বাস্তবায়ন না করার কোন পর্ব আসেনি। মাসআলাগত দিক থেকেও আসেনি এবং বাস্তবায়নের দিক থেকেও আসেনি। মাসআলাগত দিক থেকেও কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ সব সময় ফরয ছিল এবং বাস্তবায়নের দিক থেকেও তা সব সময় সম্ভব ছিল।

ইসলামী শক্তি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র থাকা অবস্থায়ও কিতাল ফী সাবীলিল্লাহর বিধানে কোন প্রকার শীথিলতা আসেনি, আবার সর্বোচ্চ শক্তির অধিকারী হওয়ার পরও এ বিধান বাস্তবায়ন থেকে মুসলমান অবসর পায়নি।

অতএব এ দাবি করা খুবই যৌক্তিক যে, কোন অজুহাতেই আমরা কিতাল ফী সাবীলিল্লাহর ফরয দায়িত্ব থেকে ছুটি পাব না। অন্য সব ফরয দায়িত্বের মত এ দায়িত্বটি আদায় করার ক্ষেত্রেও অনেক হালাত তৈরি হবে, কিন্তু এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির কোন পর্ব কখনোই আসবে না। সাময়িক অবস্থাগুলোকে স্থায়ী অবস্থা হিসাবে বিবেচনা করে একটি ফরয দায়িত্ব সম্পর্কে গাফেল হয়ে যাওয়া এবং তা ভুলে যাওয়ার উপক্রম হওয়া খুবই ভয়াবহ বিষয়। এর পরিণতি অনেক ভয়ংকর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١٤) سورة المائدة

অনুবাদ: "আর যারা বলে আমরা নাসারা, আমি তাদের নিকট থেকেও ওয়াদা নিয়েছিলাম, কিন্তু তাদেরকেও যা কিছু উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার মধ্য হতে তারা একটা অংশ ভুলে গেল। সুতরাং আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতা সঞ্চার করে দিলাম কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এবং অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সংবাদ দেবেন।" -সূরা মায়িদা- ০৫: ১৪

একটি অকাট্য বিধানকে এভাবে সবাই মিলে অবজ্ঞার সাথে ছেড়ে দিলে তাই ঘটবে যা ঘটার ধমকি আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন এবং তা ঘটেও চলেছে। আমরা যখন আল্লাহর দুশমন ও মুসলমানদের দুশমনদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের ফরয দায়িত্বের কথা ভুলে গেছি, তখন আমরা মুসলমানের বিরুদ্ধে সে অস্ত্রকে শানিত করে চলেছি। ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই সে অস্ত্রের অনুশীলন করে চলেছি। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন।

সামর্থ্য ইত্যাদি না থাকা হচ্ছে একেবারেই একটি সাময়িক হালাত। যার অজুহাতে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ এমনকি শতাব্দীর পর শতাব্দী একটি ফরয আমলকে ভুলে থাকা যায় না। এমন একটি আমল

থেকে অবসর থাকা যায় না। এ বিষয়ে বেফিকির থাকার যে ধারা চালু হয়েছে, তা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

শেষ কথা

সামর্থ্যের আলোচনায় আমরা কথায় কথায় বহুদূর চলে এসেছি। সামর্থ্য বিষয়ক আলোচনার একটি সারসংক্ষেপ এখানে তুলে ধরছি। সাধারণত দু'টি ক্ষেত্রে সামর্থ্যের আলোচনাটি বার বার আসে।

এক. কাফের রাষ্ট্র ও কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করার ক্ষেত্রে মুসলিম দেশ ও ইসলামী শক্তির জিহাদ করার সামর্থ্য।

দুই. মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের মুরতাদ, মুনাফিক ও মুলহিদ রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ও ইসলামী শক্তির জিহাদ করার সামর্থ্য।

প্রথম ক্ষেত্রে কাফেরদের বিরুদ্ধে এবং একটি দারুল হারবের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য একটি মুসলিম দেশের কাছে সামর্থ্যের সব কিছুই আছে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের মুরতাদ, মুনাফিক ও মুলহিদ রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য পুরা দেশের জনশক্তি রয়েছে। যে জনশক্তির সামনে রাষ্ট্রপ্রধান ও তার সীমিত জনবল কিছুই নয়। অতএব এখানে সামর্থ্যের শতভাগ উপস্থিতি রয়েছে।

এ পর্যায়ে এসে মনে রাখতে হবে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের যে শক্তিগুলো মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ নেবে তারাও মুজাহিদদের বুলেটের লক্ষবস্ত হবে। সেনাবাহিনী, আধাসামরিক বাহিনী, পুলিশ, আদালত ও জনশক্তির যে যে অংশ মুরতাদর সরকারের পক্ষ নেবে তাদের সবার রক্ত হালাল, তারা সবাই মুজাহিদদের বুলেটের লক্ষবস্ত।

অতএব আমাদেরকে দুই কথার এক কথায় আসতে হবে। হয়ত বলতে হবে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের সরকার ও তার সকল সামরিক

শক্তি মুসলমান, অথবা বলতে হবে তারা মুরতাদ। তারা হয়ত ইসলামের পক্ষ নিয়ে কাফেরের বুকে বুলেট বিদ্ধ করবে, নয়ত তারা মুসলমানদের বুলেট গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। এখানে তৃতীয় কোন স্তর নেই। আমাদের কর্ণধারগণ ও যিম্মাদারগণ বিষয়টিকে সেভাবে চিন্তা করলে অনেক অস্পষ্টতা কেটে যাবে। সামর্থ্যের বিষয়ে যে ধুম্রজাল তৈরি হয়ে আছে তা ইনশাআল্লাহ কেটে যাবে।

একজন মুসলমান সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় তার দিন রাত কাটাতে পারে না। মুসলমানের প্রতিটি অবস্থার জন্য শরীয়তে সুস্পষ্ট বিধান দেয়া আছে। সে বিধানে সফলতার নিশ্চয়তা দেয়া আছে। হতাশ হওয়া, নিরাশ হওয়া, ঘাবড়ে যাওয়া বা গাফেল থাকার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুন, আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন।

সামর্থ্যের বাস্তবতাঃ কয়েকটি উদাহরণ

এক. মুরতাদ তাতার রাষ্ট্র প্রধানের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিদ্রোহ: ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ এর ফাতওয়া

وقوله: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكَم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان، الذي وضع لهم اليَساق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه،

فصارت في بنيه شرعًا متبعًا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. تفسير ابن كثير، سورة المائدة 50

অনুবাদ: "আল্লাহর বাণী أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ এখানে মহান আল্লাহ ঐ লোকগুলোর কথার প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, যারা আল্লাহর এমন হুকুম থেকে দূরে সরে থাকে, যার মধ্যে সমস্ত মঙ্গল বিদ্যমান রয়েছে এবং যা থেকে সমস্ত অমঙ্গল দূরে আছে, এরূপ পবিত্র হুকুম থেকে সরে গিয়ে কিয়াসের দিকে, কু-প্রবৃত্তির দিকে এবং ঐসব হুকুমের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা লোকেরা কোন দলিল প্রমাণ ছাড়াই নিজেদের পক্ষ থেকে বানিয়ে নিয়েছে। যেমন জাহেলি যুগের লোকেরা এবং ভ্রষ্ট ও অজ্ঞ লোকেরা নিজেদের মত ও মর্জি মোতাবেক বিধি-বিধান জারি করত। এমনিভাবে যেমন তাতারীরা রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে চেঙ্গিজখানী বিধানের অনুসরণ করত, যে তাদের জন্য ইয়াসাক তৈরি করে দিয়েছিল। তা ছিল বহুমুখী বিধিবিধানের সমষ্টি, যা ইহুদী, ঈসায়ী, ইসলাম ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদ থেকে নেয়া হয়েছে। আবার তাতে এমনও অনেক বিধান ছিল যা নিছক নিজেদের মত ও মনষ্কামনার ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। ফলে সেটি তার সন্তানদের মাঝে একটি অনুসৃত শরীয়ত হিসাবে গৃহীত হয়েছে, যাকে তারা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া বিধানের উপর প্রাধান্য দিত। তাদের মধ্য থেকে যারা এমন করবে তারা কাফের, তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব; যতক্ষণ না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানের দিকে ফিরে আসে এবং অল্প বিস্তর সর্বক্ষেত্রে একমাত্র তা দিয়ে ফায়সালা করবে।" -তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা মায়েদাহ ৫০

ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ এর ফাতওয়া:

ومن كان عنده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير، ويعزر الكبير على ذلك تعزيرا بليغا؛ لأنه عصى الله ورسوله، وكذلك من عنده مماليك كبار، أو غلمان الخيل والجمال والبزاة، أو فراشون أو بابية يغسلون الأبدان والثياب، أو خدم، أو زوجة، أو سرية، أو إماء، فعليه أن يأمر جميع هؤلاء بالصلاة، فإن لم يفعل كان عاصيا لله ورسوله، ولم يستحق هذا أن يكون من جند المسلمين، بل من جند التتار. فإن التتار يتكلمون بالشهادتين، ومع هذا فقتالهم واجب بإجماع المسلمين. وكذلك كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة، أو الباطنة المعلومة، فإنه يجب قتالها، فلو قالوا: نشهد ولا نصلي قوتلوا حتى يصلوا، ولو قالوا: نصلي ولا نزكي قوتلوا حتى يزكوا.

ولو قالوا: نزكي ولا نصوم ولا نحج، قوتلوا حتى يصوموا رمضان. ويحجوا البيت. ولو قالوا: نفعل هذا لكن لا ندع الربا، ولا شرب الخمر، ولا الفواحش، ولا نجاهد في سبيل الله، ولا نضرب الجزية على اليهود والنصارى، ونحو ذلك. قوتلوا حتى يفعلوا ذلك. مجموع فتاوى ابن تيمية 51/22، طبعة وزارةالشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية عام1425

অনুবাদ: “কারো কাছে ছোট গোলাম, এতিম অথবা সন্তান থাকলে যদি সে তাকে নামাযের জন্য আদেশ না করে তাহলে ছোটকে নামাযের আদেশ না করার কারণে বড়কে শাস্তি দেয়া হবে এবং এ কারণে বড়কে কঠিন শায়েস্তা করা হবে। কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করেছে। এমনিভাবে যার কাছে বড় গোলাম আছে, ঘোড়া-উট-বাজ ইত্যাদির রাখাল আছে, ঘরের কর্মচারী-ধোপা ইত্যাদি আছে, অথবা খাদেম, স্ত্রী, বাঁদী ইত্যাদি থাকে, তাহলে তার দায়িত্ব তাদের সবাইকে নামাযের আদেশ করা। সে যদি আদেশ না করে তাহলে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে। সে মুসলমান সৈনিকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার

অধিকার পাবে না; বরং সে হবে তাতারী সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তাতারীরা মুখে শাহাদাতাইন উচ্চারণ করে, এরপরও সকল মুসলমানের ঐক্যমতে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব। এমনিভাবে যে দলগুলো ইসলামের বিধানাবলী থেকে কোন একটি বাহ্যিক বিধান বা কোন একটি আকীদাগত স্বীকৃত বিধানকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে তাদের বিরুদ্ধেই জিহাদ করা ওয়াজিব হবে।

তারা যদি বলে, আমরা যাকাত দেব, কিন্তু রোযা রাখব না এবং হজ্জ করব না, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে যতক্ষণ না তারা রমযানের রোযা রাখবে এবং বাইতুল্লাহে গিয়ে হজ্জ করবে। যদি তারা বলে, আমরা এটা করব, কিন্তু আমরা সুদের লেনদেন ছাড়ব না, মদ পান করা ছাড়ব না, অশ্লীলতা ছাড়ব না, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করব না, ইহুদি-খ্রিস্টানদের উপর কর আরোপ করব না ইত্যাদি ইত্যাদি, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে, যতক্ষণ না তারা তা করে।" - মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২২/৫১

তিনি অপর এক প্রসঙ্গে বলেন-

وقد ظهر مصداق هذه النصوص النبوية على أكمل الوجوه في جهادنا للتتار وأظهر الله للمسلمين صدق ما وعدناهم به وبركة ما أمرناهم به وكان ذلك فتحا عظيما ما رأى المسلمون مثله منذ خرجت مملكة التتار التي أذلت أهل الإسلام؛ فإنهم لم يهزموا ويغلبوا كما غلبوا على " باب دمشق " في الغزوة الكبرى. التي أنعم الله علينا فيها من النعم بما لا نحصيه: خصوصا وعموما. والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. مجموع فتاوى ابن تيمية 510/27، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية عام1425هـ

অনুবাদ: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসগুলোর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটেছে তাতারীদের বিরুদ্ধে আমাদের জিহাদের

ক্ষেত্রে। আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে যে ওয়াদা করেছেন তার সত্যতা তিনি মুসলমানদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন, এমনিভাবে তাদের ব্যাপারে আমাদেরকে যে আদেশ করেছেন তার বরকতও প্রকাশ করে দিয়েছেন। আর তা ছিল এক মহান বিজয়, তাতারী সাম্রাজ্য আত্মপ্রকাশ করার পর মুসলমরা যেমন বিজয় আর দেখেনি। যে তাতারীরা আহলে ইসলামকে অপদস্থ করেছে। কেননা তারা হেরে যায়নি; বরং তারা বিজয় লাভ করেছে যেমনিভাবে তারা বড় যুদ্ধের সময় বাবে দিমাশকে বিজয় লাভ করেছে। এটা আমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ, যে অনুগ্রহের কোন সীমা পরিসীমা নেই। অসংখ্য সুন্দর বরকতময় সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য, যেমন তিনি চান এবং যেমন প্রশংসার উপর তিনি সন্তুষ্ট এবং যা তাঁর দয়াময় ও পরাক্রমশালী সত্ত্বার জন্য উপযুক্ত।" -মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২৭/৫১০

তিনি আরেক প্রসঙ্গে বলেন-

وما كان يقصده أكابر الأئمة العادلين: من جهاد أعداء الله المارقين من الدين وهم صنفان: أهل الفجور والطغيان وذوو الغي والعدوان الخارجون عن شرائع الإيمان طلبا للعلو في الأرض والفساد وتركا لسبيل الهدى والرشاد. وهؤلاء هم التتار ونحوهم من كل خارج عن شرائع الإسلام وإن تمسك بالشهادتين أو ببعض سياسة الإسلام. والصنف الثاني: أهل البدع المارقون وذوو الضلال المنافقون الخارجون عن السنة والجماعة المفارقون للشرعة والطاعة. مجموع فتاوى ابن تيمية 399/28، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية عام1425

অনুবাদ: "আর দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাওয়া আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার বিষয়ে যে মধ্যমপন্থী বিশিষ্ট ইমামগণ বলেছেন সেসব দুশমন দুই প্রকার। প্রথম প্রকার হচ্ছে, পাপাচার, অবাধ্য, ভ্রষ্ট ও ইসলামবিদ্বেষী গোষ্ঠী, যারা ঈমানের বিধানাবলী থেকে বের হয়ে গেছে।

যারা পৃথিবীতে প্রভাব প্রতিপত্তি ও ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায়। যারা হেদায়াত ও সঠিকতার পথ ত্যাগ করতে চায়। এরা হচ্ছে তাতারী গোষ্ঠী এবং তাদের মত যারা ইসলামের বিধানাবলী থেকে বেরিয়ে গেছে, যদিও তারা শাহাদাতাইন উচ্চারণ করে এবং কিছু ইসলামী রাজনীতিকে গ্রহণ করে। আর দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, পথচ্যুত বিদআতী গোষ্ঠী এবং ভ্রষ্ট মুনাফিক গোষ্ঠী যারা সুন্নাত ও জামাআত থেকে বেরিয়ে গেছে এবং যারা অনুসৃত পথ ও আনুগত্য থেকে আলাদা হয়ে গেছে।" -মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২৮/৩৯৯

দুই. পরাশক্তি রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান মুসলমানদের জিহাদ:

আফগান মুসলমানরা যখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখন রাশিয়া বিশ্বের প্রধান দু'টি শক্তির একটি। সারা বিশ্বের দু'টি ভাগের একটি ভাগের নেতৃত্ব দিচ্ছিল রাশিয়া। বিশ্বের দু'টি প্রধান কুফরী শক্তির একটি ছিল রাশিয়া, আর আফগান মুসলমানরা সে শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, জিহাদ করেছিল এবং বিজয় লাভ করেছিল। মুসলমানদের সে বিদ্রোহ ও জিহাদ বিশ্বের সকল মুসলমানের কাছে জিহাদ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। মুজাহিদগণ আল্লাহর পথের মুজাহিদ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। এ পথে যাঁরা জীবন দিয়েছিলেন তাঁরা শহীদ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

ইতিহাস বলে, আফগান মুজাহিদগণ যখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তখন তাদের জনবল, অস্ত্রবল ও অর্থবল কোনটাই এমন ছিল না যাকে তৎকালীন রাশিয়ার সমরশক্তির সাথে তুলনা করা যায়। দশ বছর পর্যন্ত তাঁরা সর্বোচ্চ ক্লাসিনকোভ দিয়ে জিহাদ করেছেন, একেবারে শেষের দিকে এসে আমেরিকা থেকে তাঁরা কিছু বিমানবিধ্বংসী মিসাইল পেয়েছিলেন। ট্যাংক, যুদ্ধবিমান, পারমাণবিক অস্ত্র, লক্ষ লক্ষ সেনা ইত্যাদির কিছুই তাঁদের ছিল না। যখন শত্রুপক্ষের কাছে এসবের সবই ছিল। কিন্তু এরপরও সে জিহাদ বিশ্বের মুসলমানদের কাছে জিহাদের আদর্শ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল।

তিন. আমেরিকা ও বিশ্ব কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে তালেবানের জিহাদ:

আমেরিকার নেতৃত্বে বিশ্ব কুফরী শক্তি তালেবানের বিরুদ্ধে বিশ বছর যাবত লড়াই করে, নিজেদের মান-সম্মান, সৈন্য, সামর্থ্য সব হারিয়ে শেষ পর্যন্ত তালেবানের হাতে অপমানজনক আত্মসমর্পণ করে এখন বিদায় নিয়ে যাচ্ছে। এই তালেবান যখন জিহাদের পথে পথ চলা শুরু করে, তখন তাদের সঙ্গ দেয়ার মত মুসলমানের সংখ্যা একশতও ছিল না। কিন্তু জিহাদের পথে তাদের ধারাবাহিক পথচলা, কুফরশাসিত পৃথিবীতে একটি দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা, আমেরিকার নাভি ও মস্তুতে সাহসী আঘাত, শরীয়তের মানদন্ডকে শ্রদ্ধা করে একজন আল্লাহর পথের মুজাহিদকে কাফেরদের হাতে তুলে না দিয়ে তার বিনিময়ে জীবন-মরণের ঝুঁকি মাথায় তুলে নেয়া এবং সব শেষে বিশ্ব কুফরীশক্তির গিরায় গিরায় আঘাত করে তাদেরকে আত্মসমর্পণের ঘাটে পৌঁছে দেয়ার গর্বে বিশ্বের মুসলমান গর্ববোধ করে চলেছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম সে গর্ব করতে থাকবে এবং একটি আদর্শ হিসাবে তাকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

এসবই আমাদের সামর্থ্যকে প্রমাণ করে। অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত মুসলমানদের সামর্থ্যের নমুনা এমনই ছিল এবং বিজয়ের উদাহরণগুলো এমনই। অতএব পরিস্থিতি যাই হোক-

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

অনুবাদ: "তোমরা হীনবল হয়ো না, বিষন্ন হয়ো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই জয়ী হবে"। সূরা আলে ইমরান- ০৩: ১৩৯

শরীয়তের কিছু মৌলিক নীতিমালা:

প্রসঙ্গটি ছিল মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ক্ষেত্রে হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর নামে প্রচারিত দু'টি শর্ত। যে দু'টি শর্তের ব্যাপক প্রচার করা হয়ে থাকে সে দু'টি শর্ত সম্পর্কে আমরা কিছু তথ্য তালাশ করে দেখার চেষ্টা করেছি যে, আসলে তিনি এমন কথা

বলেছিলেন কি না? তাঁর যে কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে শর্ত দু'টি প্রচার করা হয়েছে সেগুলোতে শর্ত দু'টি এভাবে পাওয়া যায়নি যেভাবে তাঁর পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়েছে। আর সে বিষয়টিই এপর্যন্ত বিস্তারিত দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীগণকে মনে রাখতে হবে, শরীয়তের একটি মাসআলাকে তাহকীক করার ক্ষেত্রে সালাফের কোন একজনের একটি ফাতওয়া বা একটি মত প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনায় আসতে পারে, কিন্তু তা কখনো সিদ্ধান্তের মাপকাঠি নয়। আমাদের সালাফগণ যেমন বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন, তেমনিভাবে সিদ্ধান্তের মাপকাঠিও দিয়ে গেছেন। আমরা যেকোন মাসআলা তাহকীক করতে গেলে সে মাপকাঠিগুলোকে সামনে রেখেই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর সেজন্য এখানে শরীয়তের কিছু মৌলিক নীতিমালা উল্লেখ করা হচ্ছে, যা যেকোন মাসআলার ক্ষেত্রে আমাদেরকে সহযোগিতা করবে ইনশাআল্লাহ।

আমাদের সামনে যখন যে মাসআলা আসবে, যখন যে পরিস্থিতি আসবে তখন পারিপার্শ্বিক হালাতের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে শরীয়তের যে মূলনীতিগুলোর উপর আমাদেরকে চলতে হবে সেসব মূলনীতির প্রাসঙ্গিক কয়েকটি এখানে সামান্য পর্যালোচনাসহ তুলে ধরছি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে শরীয়তের এ মূলনীতিগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

এক. ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ বলেন, যা মূলত সকল মুজতাহিদ ইমাম মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের কথা-

إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم, والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم، أخذت بقول أصحابه من شئت، وأدع قول من شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم .

فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن المسيب -وعدَّد منهم رجالًا، فلي أن أجتهد كما اجتهدوا .

الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، ابن عبد البر الماكي القرطبي ص:٢٦٤-٢٦٥

অনুবাদ: "আমি আল্লাহর কিতাবে পেলে তাই গ্রহণ করি। আর যদি কুরআনে না পাই তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এবং সহীহ হাদীসসমূহ গ্রহণ করি যা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে পৌঁছেছে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে। আর যদি কিতাবুল্লাহ বা সুন্নতে রাসূলের কোথাও না পাই তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্য থেকে যার রায় পছন্দ হয় গ্রহণ করি, যা পছন্দ নয় গ্রহণ করি না। কিন্তু তাদের মতের বাহিরে অন্য কারো মত বা রায় গ্রহণ করি না।

আর যখন বিষয়টি ইবরাহীম নাখায়ী, শা'বী, হাসান বসরী, আতা, ইবনে সীরীন ও সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব পর্যন্ত গড়ায়, তখন আমারও ইজতেহাদ করার অধিকার রয়েছে যেমন তাঁরা ইজতেহাদ করেন। কারণ তাঁরা তো এমন লোকই যারা ইজতেহাদ করে মাসআলা বর্ণনা করেন।" আলইনতিকা পৃ. ২৬৪-২৬৫

অর্থাৎ, পর্যায়ানুক্রমে কুরআন, হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের আমল হচ্ছে সিদ্ধান্ত নেয়ার মাপকাঠি। সমকালীন ও নিকট অতীতের ব্যক্তিবর্গের নির্দেশনা হচ্ছে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সহযোগী।

দুই. যে কোন উদ্ভূত মাসাআলায় কেয়াস করে সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য ফুকাহায়ে কেরাম নিম্নোক্ত শর্তাবলী আরোপ করেছেন-

شروط صحة القياس خمسة:

أحدها أن لا يكون في مقابلة النص، والثاني أن لا يتضمن تغيير حكم من أحكام النص، والثالث .....، والرابع .....، والخامس أن لا يكون

الفرع منصوصا عليه. أصول الشاشي، لنظام الدين الشاشي المتوفى ٣٤٤هـ، ص:١٩٤، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان

অনুবাদ: "কেয়াস সহীহ হওয়ার শর্ত পাঁচটি: এক. তা কোন আয়াত হাদীসের বিপরীত না হতে হবে। দুই. তার কারণে কুরআন হাদীসের কোন হুকুমে পরিবর্তন আসতে পারবে না। তিন. .....। চার. .....। পাঁচ. উৎসারিত মাসআলার বিষয়ে কোন আয়াত ও হাদীস না থাকতে হবে।" -উসূলুশ শাশী, নিযামুদ্দীন শাশী রহিমাহুল্লাহ মৃত: ৩৪৪হি. পৃ: ১৯৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন

যিনি যে ফাতওয়াই দেবেন, যিনি যত শক্তিশালী কেয়াসই পেশ করবেন, সর্বাবস্থায় সে কেয়াস ও ফাতওয়ার ভিত্তিতে এমন কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না যা আয়াত ও হাদীসের বিপরীত হয়, বা এমন সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না যার দ্বারা শরীয়তের কোন হুকুমের বিপরীত কিছু সাব্যস্ত হয়, এমনিভাবে কেয়াস করে এমন কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না যে বিষয়ে আগে থেকে আয়াত বা হাদীস রয়েছে।

কারো ফাতওয়া ও সিদ্ধান্তের উপর ভরসা করে এ দাবি করা যাবে না যে, তিনি যেহেতু বলেছেন নিশ্চয় তার কাছে দলিল আছে। যে ক্ষেত্রে দলিল থাকা জরুরী সে ক্ষেত্রে দলিল দেখানোও জরুরী। উম্মতের কারো শুধুমাত্র আমল ও ফাতওয়া এ কথার প্রমাণ নয় যে, তার কাছে দলিল আছে। অথবা তিনি যে আয়াত বা হাদীসের আলোকে আমল করেছেন বা ফাতওয়া দিয়েছেন, তা সবার দৃষ্টিতে দলিল হওয়ার উপযুক্ত হওয়াও জরুরী নয়। তাই সর্ববাস্থায় দলিল প্রমাণ দেখেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

তিন. মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের নির্দেশনা অনুযায়ী কুরআন হাদীসের অনুসরণ সবচাইতে নিরাপদ এবং সঠিকতার নিশ্চয়তা দানকারী। তবে শরীয়তের স্বীকৃত দলিল প্রমাণের বিপরীতে শুধু কোন ফকীহ মুজতাহিদের উদ্ধৃতি যথেষ্ট নয়। শরীয়তের স্বীকৃত দলিলের বিপরীতে ফকীহ মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে তাঁর সিদ্ধান্তের পক্ষের দলিল সামনে আনতে হবে।

চার. কোন মাসআলায় ফকীহ মুজতাহিদগণ দুই ধরনের সিদ্ধান্ত দিলে পরবর্তী অনুসারীরা সে মতটিকেই অগ্রাধিকার দেবে যে মতের পক্ষে দলিল শক্তিশালী।

পাঁচ. একটি বিশেষ ভূখন্ডের যিম্মাদার ওলামায়ে কেরাম সে এলাকার সার্বিক অবস্থা বেশি জানবেন এবং শরয়ী কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাদের ফাতওয়া ও মতামতই বেশি সঠিক হবে। যার দরুন অন্যদের তুলনায় তাঁদের মতামত অগ্রাধিকার পাবে। এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু যেসব কারণে এলাকার ওলামায়ে কেরামের মতামত অগ্রাধিকার পায়, সে কারণগুলো অনুপস্থিত থাকলে, অথবা এলাকার ওলামায়ে কেরাম যে অভিমত দিয়েছেন সে মতের পক্ষের দলিল প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থিত হওয়ার পর যদি বিপরীত মত সামনে আসে এবং বিপরীত মতের পক্ষের দলিল প্রমাণও সামনে থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে দলিলের আলোকেই কোন একটি মত প্রাধান্য পাবে। দলিলের বিপরীতে এলাকার ওলামায়ে কেরামের অভিমতকে প্রাধান্য দেয়ার কোন সুযোগ নেই।

ছয়. হালাতের পরিবর্তনের কারণে শরীয়তের যে বিধানগুলোতে কোন প্রকার পরিবর্তন আসার সুযোগ নেই, হালাতের কারণে যেসব মাসআলা প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ নেই, এমনিভাবে যেসব হালাত আগেও ছিল এখনো আছে সেসব ক্ষেত্রে হালাতের ওযর পেশ করে বিধান বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকার কোন সুযোগ নেই।

সাত. শরীয়তের যেসকল বিধান বাস্তবায়নের পদ্ধতিসহ কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া আছে, সেসব বিধান বাস্তবায়নের এমন কোন পদ্ধতি আবিষ্কার করার কোন সুযোগ নেই যে পদ্ধতির সাথে কুরআন হাদীসে বাতলানো পদ্ধতির কোন মিল নেই।

আট. শরীয়তে একেক আমল ও দায়িত্বকে একেক নামে উল্লেখ করা হয়েছে। একেক আমল ও দায়িত্বের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি, পদ্ধতি ও মাত্রা বাতলে দেয়া হয়েছে। অতএব একটি আমলকে আরেকটি আমলের নামে ভূষিত করা এবং একটির হুকুমকে আরেকটির

জায়গায় প্রয়োগ করা কুরআন হাদীসের তাহরীফ তথা বিকৃতির শামিল। কোন অবস্থায় উম্মতের কারো উদ্ধৃতি দিয়ে তা করা যাবে না।

নয়. বিশ্বের বিশেষ কোন ভূখন্ড বা বিশেষ কোন কাফেলার সিদ্ধান্ত ও ফাতওয়াকে ইজমার মান দেয়ার কোন সুযোগ নেই। ইজমা দাবি করতে হলে শরীয়তের পরিভাষায় যাকে ইজমা বলা হয় এবং যেসব শর্ত পাওয়া গেলে তাকে ইজমার মান দেয়া যায়, সেসব কিছু পাওয়া যাওয়ার পরই কোন একটি মত বা ফাতওয়াকে ইজমাভিত্তিক ফাতওয়া বলা যাবে।

বরং কুরূনে মুতাআখখিরা তথা খায়রুল কুরুনের পর থেকে চলমান যামানা পর্যন্ত কোন ইজমাকে গ্রহণ করতে হলে তা দলিলের আলোকেই গ্রহণ করতে হবে। খায়রুল কুরূনের পর দলিলের বিপরীতে দলিলবিহীন কোন ইজমা গ্রহণযোগ্য নয়।

দশ. খায়রুল কুরূনের পর থেকে নিকট অতীত ও সমকাল পর্যন্ত উম্মতের কারো কওল-আমল-সুকৃত তথা ফাতওয়া-আমল-নিরবতার ভিত্তিতে শরয়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পেছনে সময় ও মেধা ব্যয় করার চাইতে কুরআন-হাদীস-সীরাতে সাহাবার ভিত্তিতে শরয়ী কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অনেক বেশি টেকসই ও সহজ। উম্মতের ফাতওয়া-আমল-নিরবতাকে কুরআন হাদীস বোঝার জন্য সহযোগী হিসাবে গ্রহণ করা যায়, কিন্তু কুরআন-হাদীস-সীরাতে সাহাবার বিপরীতে প্রাধান্য দেয়া যায় না।

এগার. শরয়ী দলিলের আলোকে যা ফরয ওয়াজিব হিসাবে প্রমাণিত হবে, তা সর্বাবস্থায় উম্মতের জন্য কল্যাণকর হবে। লাভ-ক্ষতি ও অভিজ্ঞতার আলোকে এমন দাবি করা যাবে না যে, আমলটি ফরয ওয়াজিব হলেও এখন এটা উম্মতের জন্য ক্ষতিকর, তাই তা এখন করা যাবে না। এমনিভাবে শরয়ী দলিলের আলোকে যা হারাম প্রমাণিত হবে, তা সর্বাবস্থায় উম্মতের জন্য ক্ষতিকর। লাভ-ক্ষতি ও অভিজ্ঞতার আলোকে এমন দাবি করা যাবে না যে, বিষয়টি হারাম হলেও উম্মতের

জন্য তা উপকারী, তাই এখন তা করতে হবে। এমন বক্তব্য ও বিশ্বাস ঈমানকে নষ্ট করে দেবে।

আমাদের করণীয়:

শরীয়তের যেকোন অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যেকোন ইস্তিফতা আসলে মুফতিয়ানে কেরাম যে তারতীব ও উসূলের অনুসরণ করে ফাতওয়া দিয়ে থাকেন, কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ এর বেলায় সে একই পদ্ধতি গ্রহণ করা চাই। কুরআনের আয়াত ও তার তাফসীর, হাদীস ও তার ব্যাখ্যা এবং এ উভয়ের ভিত্তিতে মুজতাহিদগণের যে সিদ্ধান্ত সে সিদ্ধান্তের আলোকে মুফতিয়ানে কেরাম ফাতওয়া দেবেন।

দলিলের আলোকে কোন সিদ্ধান্ত সামনে আসলে তার বিপরীত শক্তিশালী দলিল ছাড়া সে ফাতওয়ার বিপরীত কিছু বলা যাবে না। দলিলভিত্তিক ফাতওয়ার বিপরীতে তার চাইতে বেশি শক্তিশালী ও বেশি স্পষ্ট দলিলের আলোকে ভিন্ন মত সামনে আসলে তা প্রাধান্য পাবে।

গ্রহণযোগ্য দলিলের আলোকে দু'টি ভিন্ন মত সামনে আসলে একটিকে আরেকটির উপর প্রাধান্য দেয়ার যেসব স্বীকৃত উপাদান রয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে যে কোন একটিকে গ্রহণ করবে। ব্যক্তিগত সুবিধা, গোষ্ঠীগত সুবিধা, বা যেকোন ধরনের মনস্কামনার ভিত্তিতে কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না।

দলিল নির্ভর দু'টি মতের যেকোন একটিকে গ্রহণ করার দ্বারা অপর মতটি বাতিল হিসাবে গন্য হবে না। একটি মতকে গ্রহণকারী অপর মত গ্রহণকারীকে কোন প্রকার গাল মন্দ করবে না। কুরআন হাদীসের শত্রু বলবে না। বেয়াদব বলে আখ্যায়িত করবে না। এ জাতীয় অনর্থক ও খারাপ শব্দ ব্যবহার করলে তা পর্যায়ক্রমে সাহাবী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও আঘাত করে। তাই অপ্রয়োজনীয় শব্দ ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

সত্যকে গ্রহণ করার জন্য বুকটা অনেক প্রশস্ত রাখতে হবে। ইতিহাসের এ পাতাগুলো স্মরণে রাখতে হবে-

حدثنا محمد بن العباس حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد أخبرنا الحسين بن الحسن المروزي من حفظه قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كنا في جنازة فيها عبيد الله بن الحسن وهو على القضاء فلما وضع السرير جلس وجلس الناس حوله قال فسألته عن مسألة فغلط فيها، فقلت: أصلحك الله القول في هذه المسألة كذا وكذا إلا أني لم أرد هذه إنما أردت أن أرفعك إلى ما هو أكبر منها، فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال إذا أرجع وأنا صاغر إذا أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، باب ذكر من اسمه عبيد الله

অনুবাদ: "…. আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী বলেন, আমরা এক জানাযার নামাযে শরিক হয়েছি। সেখানে উবাইদুল্লাহ ইবনে হাসান উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি বিচারপতি ছিলেন। জানাযার খাট রাখার পর তিনি বসলেন এবং লোকেরাও তার চতুর্দিকে বসে গেল। তখন আমি তাঁকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলাম, তিনি তার ভুল উত্তর দিলেন। তখন আমি বললাম, আল্লাহ আপনাকে সঠিক বুঝ দিন! এ মাসআলায় সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই এই। তবে এটা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি আপনাকে এর চাইতে বড় একটি বিষয়ের দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। এ কথা বলার পর তিনি কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রাখলেন, এরপর মাথা তুলে বললেন, আমি আমাকে ছোট জ্ঞান করে আমার ফাতওয়া থেকে ফিরে আসছি, আমি আমাকে ছোট জ্ঞান করে আমার ফাতওয়া থেকে ফিরে আসছি। **বাতিলের মাথা হওয়ার চেয়ে সত্যের লেজ হওয়া আমার কাছে অধিক প্রিয়**।" -তারীখে বাগদাদ, খতীব বাগদাদী, উবাইদুল্লাহ নাম অধ্যায়

হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর ২য় কথা: সুস্পষ্ট কুফর

সুস্পষ্ট কুফর ও অস্পষ্ট কুফরের একটি মাপকাঠি শরীয়তের পক্ষ থেকে দেয়া আছে। বলাবাহুল্য, হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ শরীয়তের বাতলে দেয়া সে স্পষ্ট কুফরের কথাই বলতে চেয়েছেন। কোন একটি কুফর আমাদের কারো কাছে সুস্পষ্ট, আবার কারো কাছে অস্পষ্ট। এর দ্বারা সুস্পষ্ট কুফর নির্ধারণ করা যাবে না। কারণ একই কুফর আজ আমাদের কাছে সুস্পষ্ট মনে হয়, আবার পরের দিন তা অস্পষ্ট মনে হয়।

যেমন হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য অনুযায়ী মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান যদি মানুষদেরকে গুনাহ করতে বাধ্য করে এবং এটা তার নিয়মে পরিণত হয়ে যায়, এমনিভাবে সে যদি গায়রে ইসলামী আইনকে ইসলামী আইনের উপর প্রাধান্য দেয়, তাহলে এটা সুস্পষ্ট কুফর। কিন্তু আমাদের যিম্মাদারদের অনেকের দৃষ্টিতে এ সুস্পষ্ট কুফর স্পষ্ট হওয়ারতো প্রশ্নই আসে না; বরং অস্পষ্ট কুফর হিসাবেও তাঁরা তা মানতে রাজি নন। আরেকটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, বর্তমান কালের যিম্মাদারগণের বড় একটি অংশ এ সুস্পষ্ট কুফরকে কবিরা গুনাহ হিসাবেও স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নন। যারা আইনের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে গুনাহ করার জন্য বাধ্য করে চলেছে এবং যারা গায়রে ইসলামী আইনকে ইসলামী আইনের উপর প্রাধান্য দিয়ে যুগের পর যুগ রাজত্ব করে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে আমাদের যিম্মাদারগণের আচরণ দেখলে বোঝা মুশকিল হবে যে, তাঁরা শাসকদের এ সুস্পষ্ট কুফরগুলোকে কোন প্রকারের গুনাহ মনে করেন কি না?

তাই বলছিলাম, সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট কুফরের বিষয়টিকে আমাদের প্রথা ও প্রচলনের হাতে ছেড়ে দেয়ার কোন সুযোগ নেই। কুরআনে, হাদীসে ও ফিকহে ইসলামীতে যে আকীদা-কথা-আমল-আচরণকে সুস্পষ্ট কুফর বলা হয়েছে, সেগুলোই স্পষ্ট কুফর।

হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর ৩য় কথা: সুস্পষ্ট প্রকাশ

হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এ সম্পর্কে বলেছেন, যাকে মুরতাদ বলা হবে তার কুফর দেখার মত নিশ্চিত হতে হবে। শুধু ধারণা নির্ভর

বর্ণনার ভিত্তিতে কাউকে মুরতাদ বলা যাবে না। সে কুফরী করেছে বলে যে কেউ বললেই তাকে মুরতাদ বলা যাবে না। সে ঐ কুফরের সাথে জড়িত কি না? তা নিশ্চিত হতে হবে।

হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ এর এ কথাটি একটি স্বতসিদ্ধ কথা। যে বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। সমস্যা হচ্ছে আমাদের বর্তমানকে নিয়ে। হযরত থানভী রহিমাহুল্লাহ যে বিষয়টিকে কুফরে সারীহ-সুস্পষ্ট কুফর বলেছেন সে কুফর আমাদের গণতান্ত্রিক শাসকবর্গ প্রকাশ্যে কোটি কোটি মানুষের সামনে ঘোষণার সাথে গ্রহণ করার পরও সে কুফর তার থেকে প্রকাশ পেয়েছে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

শাসকবর্গের প্রকাশ্য ঘোষণা, এ আধুনিক যুগে ধর্মের নিয়ন্ত্রণে দেশ চালানো সম্ভব নয়। ব্যক্তি, পরিবার, দেশ ও বিশ্বকে ধর্মের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে, সকল ধর্মের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ নীতিতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিশ্ব, দেশ, সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি পরিচালনার কোন বিকল্প নেই। আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে ধর্মের নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তি নিজেকে, তার পরিবারকে, তার সামজেকে পরিচালনা করা অপরাধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অর্থাৎ দেশের কোটি কোটি মুসলমানকে গায়রুল্লাহর আইন মানতে বাধ্য করা হচ্ছে এবং আল্লাহর আইন মেনে চলাকে অপরাধ হিসাবে সাব্যস্ত করা হচ্ছে।

এই সুস্পষ্ট কুফরের সুস্পষ্ট প্রকাশের পরও থানবী রহিমাহুল্লাহ এর পতাকাবাহীরা তাঁর উদ্ধৃতি দিয়েই এই সুস্পষ্ট কুফরকে ঈমান বলে চালিয়ে দিচ্ছে এবং এর সুস্পষ্ট প্রকাশের পরও সে কাফের-মুরতাদকে মুসলিম ও মুমিন বলে আলিঙ্গন করে চলেছে।

অতএব কুফরের কোন্ প্রকাশকে সুস্পষ্ট প্রকাশ বলা হবে এবং কোন্ প্রকাশকে অস্পষ্ট প্রকাশ বলা হবে তাও কিতাব থেকেই নিতে হবে। এসব ক্ষেত্রে বর্তমানের প্রভাবে প্রভাবিত, শঙ্কিত, ও তাড়িত ব্যক্তিবর্গের রুচির উপর নির্ভর করার কোন সুযোগ নেই। যেসব কথা ও

কাজে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায় তার তালিকা কিতাবাদিতে দেয়া আছে। সে আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

হাজার হাজার বছর আল্লাহর ইবাদত করার পরও যতটুকু কারণে ইবলিস মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, ততটুকু কারণে এখনও কোন মুসলমান মুরতাদ হয়ে যাবে। ইবলিস আল্লাহর শুধু একটি বিধানের ব্যাপারে বলেছিল, 'আমি করব না'। এখন আল্লাহর হাজার হাজার বিধানের ব্যাপারে প্রকাশ্যে বলা হচ্ছে 'আমি করব না' 'আমরা করব না'। অতএব এখানে এসে বিধান ব্যতিক্রম হওয়ার কোন কারণ নেই।

আল্লাহ আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন। অজুহাতের পথ খুঁজে নিজেকে আড়াল করার পরিবর্তে কাজের পথ খুঁজে বের করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وصلى الله على النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين

والحمد لله رب العالمين

******